ইসলামের প্রকৃত সালাহ

তওহীদ প্রকাশন

এ যামানার এমাম, এমামুয্‌যামান (The Leader of The Time)

মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

ইসলামের প্রকৃত সালাহ

যামানার এমাম, এমামুয্‌যামান (The Leader of the Time)

মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

তওহীদ প্রকাশন

৩১/৩২ পি.কে.রায় রোড, পুস্তক ভবন, বাংলাবাজার, ঢাকা।

ইসলামের প্রকৃত সালাহ

হেযবুত তওহীদের এমাম, যামানার এমাম,
এমামুয্‌যামান (The Leader of the Time)
মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

প্রকাশনা ও পরিবেশনায়

তওহীদ প্রকাশন
৩১/৩২, পি.কে. রায় রোড, পুস্তক ভবন, বাংলাবাজার, ঢাকা।
ফোন: ০১৬৭০-১৭৪৬৪৩, ০১৬৭০-১৭৪৬৫১

ISBN- 978-984-33-1561-1
প্রচ্ছদ। এস এম শামসুল হুদা
সার্বিক ব্যবস্থাপনা, অলঙ্করণ ও মুদ্রণ। মো: রিয়াদুল হাসান
প্রথম প্রকাশ। জানুয়ারি ২০০৫
চতুর্থ প্রকাশ । সংশোধিত
সেপ্টেম্বর ২০০৮
পঞ্চম প্রকাশ। পরিবর্ধিত ও সংশোধিত
মার্চ ২০১১
ষষ্ঠ প্রকাশ। ফেব্রুয়ারি ২০১৭

মূল্য: ৬০.০০ টাকা

সূচীপত্র

১. এই 'কেন'র জবাব দেওয়ার আমি চেষ্টা করছি
২. তাহলে সালাতের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব কী?
৩. সেই মহাগুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ হলো- সালাহ
৪. সালাতের আত্মিক ভাগ
৫. ছবি
৬. মেয়েদের সালাহ
৭. সালাতের এই প্রাণহীন দুরবস্থা কেন হলো, কেমন করে হলো?
৮. সালাহ ইসলামের কঙ্কাল
৯. সালাতুল খওফ
১০. জেহাদ, কেতাল ও সন্ত্রাস

আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজিম

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

মানুষের জন্য আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানে সালাতের গুরুত্ব ও মূল্য অত্যন্ত অধিক। তাঁর কোর'আনে আল্লাহ আশি বারেরও বেশি স্থানে সালাহ-কে উল্লেখ করেছেন, সালাহ কায়েম করতে বলেছেন। আজ পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ, লক্ষ লক্ষ বিরাট বিরাট সুদৃশ্য মসজিদে দিনে পাঁচবার একত্রিত হয় সালাহ কায়েম করতে, আল্লাহর আদেশ পালন করতে। কিন্তু আল্লাহ যে উদ্দেশ্যে মো'মেনদের সালাহ কায়েম করতে আদেশ করেছেন সে উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে না। একশ' পঞ্চাশ কোটির এই জাতিটি, যে জাতিটি নিজেদের মো'মেন, মুসলিম ও উম্মতে মোহাম্মদী বলে বিশ্বাস করে, এই জাতিটি আজ পৃথিবীর অন্য সব জাতি দ্বারা পরাজিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত, নিগৃহীত। আল্লাহর রসুল (সা.) পৃথিবী থেকে চলে যাবার সময় তাঁর গড়া এ জাতিটি সংখ্যায় ছিল পাঁচ লাখের মতো। এটি ইতিহাস যে আল্লাহর রসুল (সা.) চলে যাবার পর ৬০/৭০ বছরের মধ্যে ঐ ছোট্ট জাতিটি, একটি একটি করে নয়, এক সঙ্গে তদানিন্তন পৃথিবীর দু'টি বিশ্বশক্তিকে আক্রমণ করে তাদের সামরিকভাবে পরাজিত করে অর্ধেক পৃথিবীতে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করেছিল। সেই পাঁচ লাখের জাতিটিও সালাহ কায়েম করতো, আজ একশ' পঞ্চাশ কোটির এই জাতিটাও সালাহ কায়েম করে, অন্তত করে বলে বিশ্বাস করে। তাহলে সেই একই কাজ করে, আল্লাহর একই আদেশ পালন করে সেই পাঁচ লাখের প্রায় নিরক্ষর, চরম দরিদ্র জাতি বিশ্বজয় করলো আর বর্তমানের একশ' পঞ্চাশ কোটির জাতি, তাদের মধ্যে বহু উচ্চ শিক্ষিত, আলেম, পীর মোরশেদ থাকা সত্ত্বেও, বিশ্বের প্রাকৃতিক সম্পদের একটি বিরাট অংশের মালিক হওয়া সত্ত্বেও আজ বিশ্বের সমস্ত জাতি দ্বারা পরাজিত, নিগৃহীত। একই কাজ করে, আল্লাহর একই আদেশ পালন করে পরিণতি, ফল শুধু আকাশ পাতাল নয়, একেবারে উল্টো কেন?

এই 'কেন'র জবাব দেওয়ার আমি চেষ্টা করছি-

তার আগে নামাজ শব্দটি ব্যবহার না করে সালাহ শব্দ কেন ব্যবহার করছি তা বলে নেয়া দরকার। এ উপমহাদেশে সালাতের বদলে নামাজ শব্দটি ব্যবহারে আমরা এতটা অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে সালাহ বললে অনেকে বুঝিই না সালাহ কি। কোর'আনে কোথাও নামাজ শব্দটি নেই কারণ কোর'আন আরবি ভাষায় আর নামাজ পার্শি অর্থাৎ ইরানী ভাষা। শুধু ঐ নামাজ নয় আরও অনেক শব্দ আমরা ব্যবহার করি যা কোরানে নেই। যেমন খোদা, রোযা, বেহেশত, দোযখ, ফেরেশতা, জায়নামাজ, মুসলমান, পয়গম্বর ইত্যাদি। এই ব্যবহার মুসলিম দুনিয়ায় শুধু ইরানে এবং আমাদের এই উপমহাদেশে ছাড়া আর কোথাও নেই। এর কারণ আছে। কারণটি হলো- ইরান দেশটি সমস্তটাই অগ্নি-উপাসক ছিল। আল্লাহর নবীর সুন্নাহ পালনের জন্য উম্মতে মোহাম্মদী যখন ইরানকে তিন শর্তের

একটি মেনে নেয়ার আমন্ত্রণ দিলো তখন ইরান পৃথিবীর দুই বিশ্বশক্তির একটি; অন্যটি খ্রিস্টান রোমান। ঐ তিন শর্ত হলো-

১) আল্লাহর রসুল (সা.) সত্য দীন নিয়ে পৃথিবীতে এসেছেন- এই দীন মেনে নিয়ে মুসলিম হয়ে যাও, তাহলে তোমরা আমাদের ভাই হয়ে যাবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসুল এই দীনকে সমস্ত পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করার যে দায়িত্ব আমাদের ওপর অর্পণ করেছেন, সে দায়িত্ব তোমাদের ওপরও বর্তাবে।

২) যদি তা গ্রহণ না করো তবে আমাদের বশ্যতা স্বীকার করো, আমরা আল্লাহর দেয়া দীন, কোর'আনের আইন-কানুন, দণ্ডবিধি, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করব; তোমরা যার যার ধর্মে থাকবে, আমরা বাধাতো দেবই না বরং সর্বপ্রকারে তোমাদের এবং তোমাদের ধর্মকে নিরাপত্তা দেব; বিনিময়ে তোমাদের যুদ্ধক্ষম লোকেরা বার্ষিক সামান্য একটি কর দেবে, যার নাম জিজিয়া। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, স্ত্রীলোক, রোগগ্রস্ত মানুষ এবং বালক-বালিকা, শিশুগণকে এ কর দিতে হবে না। এর পরও তোমাদের রক্ষার জন্য যুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে যেসব যুদ্ধক্ষম লোক আমাদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করবে তাদের ঐ জিজিয়া দিতে হবে না।

৩) যদি এই দুই শর্তের কোনটাই না মেনে নাও তবে যুদ্ধ ছাড়া আর পথ নেই। আমরা তোমাদের আক্রমণ করে পরাজিত করে আল্লাহর দীন, জীবন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করব।

এটি ইতিহাস যে প্রচণ্ড শক্তিশালী, অন্যতম বিশ্বশক্তি ইরান অবজ্ঞাভরে ঐ প্রথম দুই শর্ত উপেক্ষা করে তৃতীয় শর্ত যুদ্ধকেই বেছে নিয়েছিল ও অল্প সময়ের মধ্যে ঐ ছোট্ট উম্মতে মোহাম্মদীর কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে গিয়েছিল। পরাজিত হবার পর প্রায় সমস্ত ইরানি জাতিটি অল্প সময়ের মধ্যে পাইকারিভাবে দীন ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম হয়ে গিয়েছিল। এই ঢালাওভাবে মুসলিম হয়ে যাবার ফলে তারা ইসলামের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী তা পূর্ণভাবে বুঝতে সমর্থ হলো না অর্থাৎ তাদের আকিদা সঠিক হলো না। তারা ইসলামে প্রবেশ করলো কিন্তু তাদের অগ্নি-উপাসনার অর্থাৎ আগুন পূজার সময়ের বেশ কিছু বিষয় সঙ্গে নিয়ে ইসলামে প্রবেশ করলো। আগুন উপাসনাকে তারা নামাজ পড়া বলতো, সালাহ-কে তারা নামাজ বলতে শুরু করলো, তাদের অগ্নি-উপাসনার ধর্মে উপবাস ছিল, তারা সাওমকে রোযা অর্থাৎ উপবাস বলতে লাগলো, মুসলিমকে তারা পার্শি ভাষায় মুসলমান, নবী-রসুলদের পয়গম্বর, জান্নাহ-কে বেহেশত, জাহান্নামকে দোযখ, মালায়েকদের ফেরেশতা এমন কি মহান আল্লাহর নাম পর্যন্ত পরিবর্তন করে খোদা ইত্যাদিতে ভাষান্তর করে ফেললো। শুধু যে সব ব্যাপার আগুন পূজার ধর্মে ছিল না, সেগুলো স্বভাবতই আরবি শব্দেই রয়ে গেল; যেমন যাকাহ, হজ্ব ইত্যাদি। তারপর মুসলিম জাতি যখন ভারতে প্রবেশ করে এখানে রাজত্ব করতে শুরু করলো তখন যেহেতু তাদের ভাষা পার্শি ছিল সেহেতু এই উপমহাদেশে ঐ পার্শি শব্দগুলোর প্রচলন হয়ে গেল। এক কথায় বলা যায় যে, আরবের ইসলাম পারস্য দেশের ভেতর দিয়ে ভারতে, এই উপমহাদেশে আসার পথে পার্শি ধর্ম, কৃষ্টি ও ভাষার রং-এ রং বদলিয়ে রঙিন হয়ে এলো।

ব্যাপারটা অনেকটা এই রকম:- অগ্নি-উপাসক ইরান না হয়ে যদি মুর্তিপূজক হিন্দু ভারত উম্মতে মোহাম্মদীর কাছে সামরিকভাবে পরাজিত হয়ে ইসলাম ভালো করে না বুঝেই ব্যাপকভাবে, ঢালাওভাবে এই দীনে প্রবেশ করতো তবে তারা সালাহ-কে পূজা বা উপাসনা, সাওমকে উপবাস, নবী-রসুলকে অবতার, জান্নাহ-কে স্বর্গ, জাহান্নামকে নরক, মালায়েকদের দেবদূত, দেবতা, আল্লাহকে ভগবান বা ঈশ্বর ইত্যাদি চালু করে ফেলতো এবং আমরা যেমন এখন নামাজ, রোযা, বেহেশত, দোযখ, পয়গম্বর, ফেরেশতা, খোদা শব্দগুলো ব্যবহার করি তেমন করে ঐ ভারতীয় শব্দগুলো ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হয়ে যেতাম।

আমরা হেযবুত তওহীদ এই পার্শি শব্দগুলোর ব্যবহার ত্যাগ করে আল্লাহ কোর'আনে যে শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন সেই শব্দগুলো আবার চালু করার চেষ্টা করছি। মহান আল্লাহ পবিত্র কোর'আনে সতর্ক করে বলে দিয়েছেন যে, আল্লাহর আছে সুন্দর সুন্দর নাম, তোমরা তাঁকে সে নামেই ডাক, যারা তাঁর নাম বিকৃত করে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে (সুরা আরাফ- ১৮০) তাই খোদা শব্দের বদলে আল্লাহ, নামাজের বদলে সালাহ এবং রোযার বদলে সাওম শব্দের আমাদের এই ব্যবহার।

মহান আল্লাহ এই মহাসৃষ্টির বিশাল থেকে ক্ষুদ্রতম যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তাঁর প্রত্যেকটারই কোনো না কোনো উদ্দেশ্য আছে; উদ্দেশ্যহীন একটি অণু বা পরমাণুও তিনি সৃষ্টি করেন নাই। তেমনি, তিনি মানবজাতিকে যা কিছু আদেশ-নিষেধ করেছেন তারও প্রত্যেকটিরই কোনো না কোনো উদ্দেশ্য আছে, উদ্দেশ্যহীন একটি ক্ষুদ্রতম আদেশও দেন নাই, কারণ তিনি সোবহান; নিখুঁত, ত্রুটিহীন। যিনি ক্ষুদ্রতম আদেশও উদ্দেশ্যহীনভাবে দেবেন না তিনি যে সালাতের আদেশ আশিবারেরও বেশি দিয়েছেন তা কি উদ্দেশ্যহীন হতে পারে? অবশ্যই নয়। এবং শুধু যে উদ্দেশ্যহীন নয় তা-ই নয়; যেহেতু তিনি এ আদেশ এতবার দিয়েছেন সেহেতু এ আদেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তাহলে সালাতের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব কী?

ইসলামে সালাতের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব এত বড় যে, তা বোঝাবার জন্য আমাকে আল্লাহর খলিফা অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টির অধ্যায় থেকে শুরু করতে হবে- যদিও খুব সংক্ষেপে।

এই মহাবিশ্ব, অগণিত ছায়াপথ, নীহারিকা, সূর্য, চন্দ্র, তারা ও এগুলো সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করার জন্য অসংখ্য মালায়েক সৃষ্টি করার পর আল্লাহর ইচ্ছা হলো এমন একটি সৃষ্টি করার যার মধ্যে স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি থাকবে। তাই তিনি নিজ হাতে সৃষ্টি করলেন আদম (আ.) আর হাওয়াকে। আদমের (আ.) মধ্যে আল্লাহ তাঁর নিজ রূহ্ থেকে ফুঁকে দিলেন (সুরা হেজর ২৯) তাঁর নিজের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিসহ সব গুণাবলি। নাম দিলেন আল্লাহর প্রতিনিধি- খলিফাতুল্লাহ। তারপর আদম ও হাওয়ার (আ.) দেহের ভেতরে প্রবেশ করে তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনায়

প্রভাব ফেলার শক্তি দিলেন ইবলিসকে আদম-হাওয়াকে পরীক্ষার জন্য (সুরা নেসা ১১৯)। আদমের (আ.) কারণে আল্লাহর সান্নিধ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে ইবলিস আল্লাহকে বলল যে তোমার এই খলিফাকে দিয়ে আমি তোমাকে অস্বীকার করাবো। জবাবে আল্লাহ বললেন- আমি যুগে যুগে নবী-রসুল পাঠিয়ে বনি আদমকে হেদায়াহ, সঠিক দিক নির্দেশনা অর্থাৎ সেরাতুল মোস্তাকীম দান করব। যারা এই সেরাতুল মোস্তাকীমের ওপর দৃঢ় থাকবে তুমি তাদের বিপথে চালনা করতে পারবে না, তারা হেদায়াতে থাকবে, তাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে আমি তাদের জান্নাতে দেব। জবাবে ইবলিস বলল- তুমি তোমার খলিফাকে যে সেরাতুল মোস্তাকীম দেবে তার সম্মুখে, পেছনে, ডানে, বামে আমি ওঁৎ পেতে বসে থাকবো (আর তাদের সে পথ থেকে ছিনিয়ে নেব); আর দেখবে যে তাদের অধিকাংশ অকৃতজ্ঞ (অর্থাৎ অধিকাংশই আমি ছিনিয়ে নেব)। এর উত্তরে আল্লাহ বললেন তোমাকে এবং যাদের তুমি সেরাতুল মোস্তাকীম থেকে ছিনিয়ে নেবে তাদের দিয়ে আমি জাহান্নাম ভর্তি করব (সুরা আ'রাফ- ১৭, ১৮)। এখানে বলা প্রয়োজন এই সেরাতুল মুস্তাকীম কী? দেখা যাচ্ছে আল্লাহর সাথে ইবলিসের চ্যালেঞ্জটি সালাহ (নামাজ), সওম (রোযা), হজ্ব, যাকাত বা চুরি ডাকাতি, ব্যাভিচার, খুন নিয়ে নয়, চ্যালেঞ্জটি এই সেরাতুল মোস্তাকীমটাকেই নিয়ে।

এই সেরাতুল মোস্তাকীম হলো-একমাত্র আল্লাহর খেলাফত করা, তাঁর প্রতিনিধিত্ব করা। এই প্রতিনিধিত্ব করতে হলে প্রথমেই মানুষকে বিশ্বাস করতে হবে এবং সাক্ষ্য দিতে হবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো এলাহ (হুকুমদাতা) নেই অর্থাৎ লা এলাহা এল্লা আল্লাহ। প্রত্যেক নবী রসুলই তার সম্প্রদায়কে আল্লাহর এই তওহীদ মেনে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ যে লা-এলাহা এল্লা আল্লাহর কথা বলেছেন তা বর্তমানে পৃথিবীতে প্রচলিত লা-এলাহা এল্লা আল্লাহ নয়। বর্তমানে মুসলিম জগতের সকলেই লা এলাহা এল্লা আল্লাহ-এ বিশ্বাস করে, কিন্তু তারা সেরাতুল মোস্তাকীমে, সহজ-সরল পথে নেই। কারণ প্রকৃত তওহীদ অর্থাৎ লা-এলাহা এল্লা আল্লাহ হচ্ছে আল্লাহকে ছাড়া আর সমস্ত রকম ক্ষমতাকে অস্বীকার করা; এবং এই অস্বীকার জীবনের সর্বক্ষেত্রে, সর্ব অঙ্গনে। এক কথায় যে কোনো বিষয়ে, যে কোনো প্রশ্নে, যেখানে আল্লাহ বা তাঁর রসুলের (সা.) কোনো বক্তব্য আছে সেখানে আর কারো কথা, আদেশ, নিষেধ, নির্দেশ অগ্রাহ্য করা (সুরা আহযাব- ৩৬); হোক সেটা ব্যক্তিগত, সামাজিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিক, আইন-কানুন, দণ্ডবিধি, অর্থনীতি, শিক্ষা, সমাজ-ব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য। এখানে আল্লাহর আদেশ-নিষেধের সঙ্গে রসুলকেও অঙ্গীভূত করছি এই কারণে যে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ হাতে-কলমে কার্যকরী করে দেখানোর দায়িত্ব তাঁর রসুলের (সা.) এবং তিনি আল্লাহর আদেশ-নিষেধ, নির্দেশের বাইরে কিছুই করেন না, কিছুই বলেন না (সুরা নজম-৩-৪)। এই হলো ইসলামের – সেরাতুল মোস্তাকীম। বর্তমানে অন্য জাতিগুলোর তো কথাই নেই- মুসলিম হবার দাবিদার এই একশ' পঞ্চাশ কোটির জাতির মধ্যেও কোথাও নেই এবং তাদের মধ্যে এ বোধ ও উপলব্ধিও নেই যে তওহীদ না থাকার অর্থই হচ্ছে শেরক ও কুফর এবং তওহীদহীন কোনো এবাদত আল্লাহ কবুল করেন না। যে বিষয়ে আল্লাহ বা তাঁর

রসুলের (সা.) কোনো নির্দেশ আছে সেটা যত ছোট, যত সামান্যই হোক সে বিষয়ে অন্য কারো নির্দেশ, ব্যবস্থা গ্রহণ মানেই শেরক, অংশীবাদ, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকেও স্বীকার করা।

শুরু হলো বিশাল খেলা, বিরাট পরীক্ষা। আল্লাহ তাঁর কথামত যুগে যুগে প্রতি জনপদে পাঠাতে লাগলেন তাঁর নবী-রসুলদের তওহীদ ও সেরাতুল মোস্তাকীম দিয়ে।

আল্লাহ নবী-রসুলদের মাধ্যমে বনি-আদম, মানুষকে আরও জানিয়ে দিলেন যে, যে বা যারা ঐ তওহীদ (আল্লাহর সার্বভৌমত্ব) এবং সেরাতুল মোস্তাকীমের ওপর অটল থাকবে, জীবনের কোনো অঙ্গনে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে মানবে না, স্বীকার করবে না তাদের তিনি সমস্ত অপরাধ, পাপ, গোনাহ মাফ করে জান্নাতে স্থান দেবেন চিরকালের জন্য (সুরা যুমার- ৫৩)। আর যে বা যারা জীবনের যে কোনো অঙ্গনে, যে কোনো বিষয়ে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ অস্বীকার করে অন্য কোনো শক্তি বা নিজেদের তৈরি আদেশ-নিষেধকে মেনে নেবে তারা জীবনে যত পুণ্য, যত সওয়াবই করুক, যত ভালো কাজই করুক আল্লাহ তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন চিরকালের জন্য (সুরা মায়েদা- ৭২, সুরা নেসা- ৪৮, বোখারী, মুসলিম, তিরমিযি)।

আল্লাহর নবী-রসুলরা যুগে যুগে প্রতি জনপদে ঐ তওহীদ, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব নিয়ে আসতে লাগলেন আর ঐ তওহীদের ওপর ভিত্তি করে দীন প্রতিষ্ঠা করতে লাগলেন। আদমের (আ.) মাধ্যমে আল্লাহ বনি-আদমকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দান করেছেন- যার ইচ্ছা সে আল্লাহর তওহীদ, সার্বভৌমত্ব স্বীকার ও গ্রহণ করতে পারে, যার ইচ্ছা তওহীদ অস্বীকার করে অন্যের প্রভুত্ব, সার্বভৌমত্ব স্বীকার করতে পারে (সুরা কাহাফ- ২৯)। যুগে যুগে আল্লাহ যাদের হেদায়াহ অর্থাৎ সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়েছেন তারা তওহীদে বিশ্বাসী হয়ে নবী রসুলকে মেনে নিয়েছে। নবী-রসুলরা তওহীদ, আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ভিত্তির ওপর দীনের এমারত, অট্টালিকা তৈরি করেছেন। যারা তওহীদে, সেরাতুল মোস্তাকীমে বিশ্বাস করেছে তারা ঐ এমারত, অট্টালিকায় বসবাস করতে শুরু করেছে।

যথাসময়ে নবী-রসুলরা পৃথিবী থেকে চলে যাবার পর ইবলিসের প্ররোচনায় মানুষ তওহীদ-ভিত্তিক ঐ এমারত ভাঙতে শুরু করেছে এবং ধীরে ধীরে ওর কাঠামো এবং শেষে ভিত্তি তওহীদসুদ্ধ ভেঙে ফেলেছে। এরপর রহমানুর রহিম আবার নবী-রসুল পাঠিয়েছেন। তাঁরা এসে মানুষকে বলেছেন- তোমরা তো আল্লাহর দেয়া দীনটাকে নষ্ট করে ফেলেছ, এমারত ভেঙে ফেলেছ এবং শেরক ও কুফরিতে ফিরে গেছ। শুধু তাই নয় এর ভিত্তি, তওহীদটাকেও তো টুকরো টুকরো করে ফেলেছ এবং শেরক ও কুফরিতে ফিরে গেছ। আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর তওহীদ, তাঁর সার্বভৌমত্ব, সেরাতুল মোস্তাকিম দিয়ে, এবং এই তওহীদের ভিত্তির ওপর দীনের এমারত তৈরি করার দায়িত্ব দিয়ে। কোনো কোনো নবীকে তার জাতি গ্রহণ করেছে, কোনো নবীকে কিছু মানুষ গ্রহণ করেছে, কিছু মানুষ আগের নবীর বিকৃত দীনটাকেই ধরে রেখেছে, আর কোনো নবীকে মানুষ ইবলিসের প্ররোচনায় অস্বীকার করেছে, এমন কি হত্যাও করেছে (সুরা মায়েদা- ৭০)।

এইভাবে নবী-রসুলদের আল্লাহর তওহীদ ও তওহীদ-ভিত্তিক দীন প্রতিষ্ঠার ধারাবাহিকতার শেষ প্রান্তে পৃথিবীতে আল্লাহ পাঠালেন তাঁর হাবিব মোহম্মদ (সা.) বিন আবদুল্লাহকে (সুরা আহযাব- ৪০)। পূর্ববর্তী সব নবী-রসুলদের মতো তিনিও সেই একই দায়িত্ব নিয়ে এলেন; আল্লাহর তওহীদ-ভিত্তিক দীন মানুষের জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে। তফাৎ শুধু এইটুকু যে পূর্ববর্তীদের দায়িত্ব ছিল তাদের যার যার সমাজ, গোত্র, জাতির মধ্যে সীমিত, আর এই শেষ-নবীর দায়িত্ব হলো সমস্ত পৃথিবীর (সুরা নেসা- ১৭০, সুরা ফোরকান- ১)।

এখন একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। গুরুত্বপূর্ণ এইজন্য যে আল্লাহ নবী-রসুলদের মাধ্যমে যে তওহীদ-ভিত্তিক দীন মানবজাতির জন্য দান করেছেন এবং শেষ নবীও যেটা মানুষকে শেখালেন সেটা আজ আর আমাদের মধ্যে নেই, ওটার শুধু খোলসটি আছে। আজ মুসলিম বলে পরিচিত জাতিটি যেটাকে দীনুল ইসলাম বলে তাদের জীবনে পালন করছে সেটা নবীর শেখানো ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত। কাজেই এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটার যে জবাব আমি এখন দেব সেটা এই বিপরীতমুখী দীনের অনুসারীদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না; শুধুমাত্র আল্লাহ যাদের হেদায়াহ করবেন তারা ছাড়া।

আল্লাহ তাঁর শেষ নবীকে পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত দীন (জীবন-ব্যবস্থা) অবলুপ্ত করে দিয়ে এই সঠিক দিক নির্দেশনা (তওহীদ, সেরাতুল মোস্তাকিম) ও এই সত্যদীন (জীবন-ব্যবস্থা, শরিয়াহ) প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দিলেন- এই সত্য আমরা পাচ্ছি প্রত্যক্ষভাবে সরাসরি কোর'আনে তিনটি আয়াত থেকে (সুরা তওবা ৩৩, ফাতাহ ২৮, সফ ৯), এবং পরোক্ষভাবে সমস্ত কোর'আনে শত শত আয়াতে। প্রশ্নটি হচ্ছে- আল্লাহ শেষ নবীকে এই বিশাল দায়িত্ব দিলেন কিন্তু কেমন করে, কোন নীতিতে তিনি এ কাজ করবেন তা কি আল্লাহ তাঁকে বলে দেবেন না? আল্লাহ সোবহান, অর্থাৎ যার অণু পরিমাণও খুঁত, ত্রুটি, অক্ষমতা, অসম্পূর্ণতা বা চ্যুতি নেই। কাজেই তাঁর রসুলকে আল্লাহ এক বিরাট, বিশাল দায়িত্ব দিলেন কিন্তু কেমন করে, কোন্ প্রক্রিয়ায় তিনি তা করবেন তা বলে দেবেন না, তা হতেই পারে না। কাজেই আল্লাহ তাঁর নবীকে ঐ দায়িত্বের সঙ্গে ঐ কাজ করার নীতি ও প্রক্রিয়া অর্থাৎ তরিকাও বলে দিলেন। সমস্ত পৃথিবীতে আল্লাহর তওহীদ-ভিত্তিক দীন প্রতিষ্ঠার নীতি হিসাবে আল্লাহ তাঁর রসুলকে দিলেন জেহাদ ও কেতাল- অর্থাৎ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও সশস্ত্র সংগ্রাম; এবং ঐ নীতির ওপর ভিত্তি করে একটি পাঁচদফার কর্মসূচি। ঐ পাঁচ দফা হলো- ১) ঐক্য, ২) শৃঙ্খলা, ৩) আনুগত্য, ৪) হেজরত, ৫) জেহাদ (সংগ্রাম) (হাদিস- তিরমিযী, মুসনাদে আহমেদ, বাব-উল-এমারাত, মেশকাত)। পৃথিবীতে প্রচলিত অন্য সমস্ত জীবন ব্যবস্থাকে নিষ্ক্রিয় করে আল্লাহর দেয়া সঠিক দিক-নির্দেশনা ও সত্যদীনকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ তাঁর শেষ নবীকে যে নীতি ও তরিকা (প্রক্রিয়া, কর্মসূচি) দিলেন সেটা দাওয়াহ নয়; সেটা কঠিন জেহাদ, সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও সশস্ত্র সংগ্রাম।

এর প্রমাণ আল্লাহর কোর'আন এবং তাঁর রসুলের (সা.) জীবনী, কথা ও কাজ। আল্লাহ তাঁর কোর'আনে সর্বাত্মক সংগ্রামকে মো'মেন, মুসলিম ও উম্মতে

মোহাম্মদীর জন্য ফরদে আইন করে দিয়েছেন সুরা বাকারার ২১৬ ও ২৪৪ নং আয়াতে, আনফালের ৩৯ নং ও আরও বহু আয়াতে। শুধু তাই নয় মো'মেন হবার সংজ্ঞার মধ্যেই তিনি জেহাদকে অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন- শুধু তারাই সত্যনিষ্ঠ মো'মেন যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের (সা.) ওপর ঈমান এনেছে এবং তারপর আর কোনো দ্বিধা-সন্দেহ করেনি এবং প্রাণ ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করেছে (সুরা হুজরাত ১৫)। এই আয়াতে আল্লাহ মো'মেন হবার জন্য দু'টি শর্ত রাখছেন। প্রথমটি হলো আল্লাহ ও তাঁর রসুলের (সা.) উপর ঈমান; এটির অর্থ হলো জীবনের সর্ব অঙ্গনে- ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, জাতীয়-আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আইন-কানুন, দণ্ডবিধি, অর্থনীতি, শিক্ষা- এক কথায় যে কোনো বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের কোনো বক্তব্য আছে, আদেশ-নিষেধ আছে সেখানে আর কাউকে গ্রহণ না করা, কারো নির্দেশ না মানা যা পেছনে বলে এসেছি এবং এ ব্যাপারে বাকি জীবনে কোনো দ্বিধা, কোনো সন্দেহ না করা অর্থাৎ তওহীদ। দ্বিতীয়টি হলো আল্লাহর ঐ তওহীদ, সার্বভৌমত্বকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন ও সম্পদ দিয়ে সংগ্রাম, যুদ্ধ করা। কারণ ঐ তওহীদ এবং তওহীদ-ভিত্তিক দীন, জীবন-ব্যবস্থা যদি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা না হয় তবে দীনই অর্থহীন, যেমন বর্তমানের অবস্থা। এই দু'টি শর্ত হলো মো'মেন হবার সংজ্ঞা। যার বা যাদের মধ্যে এই দু'টি শর্ত পূরণ হয়েছে সে বা তারা প্রকৃত মো'মেন আর যে বা যাদের মধ্যে এই দু'টির মধ্যে একটি বা দু'টি শর্তই পুরণ হয় নি, সে বা তারা প্রকৃত মো'মেন নয়; এবং মো'মেন নয় মানেই হয় মোশরেক, না হয় কাফের।

আল্লাহ জেহাদকে মো'মেন হবার সংজ্ঞার মধ্যে শর্ত হিসাবে দিলেন, কেতাল অর্থাৎ সশস্ত্র সংগ্রামকে ফরদে আইন করে দিলেন, তারপর সরাসরি হুকুম দিলেন- সশস্ত্র সংগ্রাম (যুদ্ধ) করো (সুরা বাকারা ২৪৪)। আরও বললেন- সশস্ত্র সংগ্রাম (যুদ্ধ) করতে থাকো তাদের বিরুদ্ধে যে পর্যন্ত না সমস্ত অন্যায় অশান্তি বিলোপ হয়ে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা হয় (সুরা আনফাল ৩৯)। এইসব সরাসরি হুকুম ছাড়াও সমস্ত কোর'আনে আল্লাহ ছয়শত বারের বেশি সর্বাত্মক সংগ্রামের উল্লেখ করেছেন। আল্লাহর এই নীতির প্রতিধ্বনি করে তার রসুল বললেন- আমি আল্লাহর আদেশ পেয়েছি পৃথিবীর মানুষের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রাম (যুদ্ধ) চালিয়ে যেতে যে পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ ছাড়া এলাহ নেই এবং আমি মোহাম্মদ আল্লাহর রসুল এবং সালাহ প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত দেয় [হাদিস- আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বোখারী]। এছাড়াও আল্লাহ তাঁর কোর'আনে এবং আল্লাহর রসুল (সা.) তাঁর জীবনের কাজে ও কথায় সন্দেহাতীতভাবে আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন যে আল্লাহর তওহীদ-ভিত্তিক এই দীনুল ইসলাম, দীনুল হককে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করার নীতি হচ্ছে সামরিক, অর্থাৎ জেহাদ, কেতাল। আল্লাহ নীতি হিসাবে যুদ্ধকে নির্ধারণ করেছেন বলেই তাঁর নির্দেশে তাঁর রসুল মাত্র সাড়ে নয় বছরের মধ্যে কম করে হলেও ৭৮টি যুদ্ধ করেছেন।

দীন প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ তাঁর রসুলকে যে পাঁচ দফা কর্মসূচি দিয়েছেন তার প্রথম চার দফা অর্থাৎ ১) ঐক্য, ২) শৃঙ্খলা, ৩) আনুগত্য, আদেশ প্রতিপালন, ৪) হেজরত হলো জেহাদ করার প্রস্তুতি এবং পঞ্চম দফা হচ্ছে জেহাদ, সংগ্রাম।

প্রথম চার দফা ছাড়া যুদ্ধ করা যাবে না। জেহাদকে, সশস্ত্র সংগ্রামকে আল্লাহ নীতি হিসাবে নির্ধারণ করেছেন বলেই এই দীনে শহীদ ও মোজাহেদদের সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার দেয়ার অঙ্গীকার করেছেন, জান্নাত নিশ্চিত করে দিয়েছেন (সুরা সফ ১০-১২), এমন নিশ্চয়তা এই জাতির, উম্মাহর আর কোনো শ্রেণি বা প্রকারের মানুষকে তিনি দেন নি। আল্লাহর এই নীতি নির্ধারণ তাঁর রসুল বুঝেছিলেন বলেই তিনি ২৩ বছরের কঠোর সাধনায় যে সংগঠন গড়ে তুললেন সেটার ইতিহাস দেখলে সেটাকে একটি জাতি বলার চেয়ে একটি সামরিক বাহিনী বলাই বেশি সঙ্গত হয়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে এই বাহিনী তার জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে প্রায় একশ' বছর পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন সশস্ত্র সংগ্রাম করে গেছে; এর সর্বাধিনায়ক (আল্লাহর রসুল) থেকে শুরু করে সাধারণ সৈনিক (মোজাহেদ) পর্যন্ত একটি মানুষও বোধহয় পাওয়া যেত না যার গায়ে অস্ত্রের আঘাত ছিল না; হাজারে হাজারে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেয়ার কথা তো বলার অপেক্ষাই রাখে না।

তাহলে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে তওহীদ, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব-ভিত্তিক এই দীনকে সমস্ত পৃথিবীতে কার্যকর করে মানবজাতির জীবন থেকে সমস্ত অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার ও রক্তপাত দূর করে শান্তি (ইসলাম) প্রতিষ্ঠা করার জন্যই আল্লাহ তাঁর রসুলকে পৃথিবীতে পাঠালেন এবং ঐ কাজ করার নীতি হিসাবে নির্ধারিত করে দিলেন সংগ্রাম ও সশস্ত্র সংগ্রাম এবং জেহাদ-ভিত্তিক একটি ৫ দফার কর্মসূচি। তাঁর রসুল ঐ নীতি ও কর্মসূচির অনুসরণ করে গড়ে তুললেন এক দুর্দম, দুর্ধর্ষ, অপরাজেয় সামরিক বাহিনী যার নাম হলো উম্মতে মোহাম্মদী। এই উপলব্ধি (আকিদা) থেকে আজ আমরা লক্ষ-কোটি মাইল দূরে অবস্থান নিয়েছি। এই কথা কোর'আন এবং হাদিস থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করা যায়। কিন্তু তা করতে গেলে এই নিবন্ধ অতি বড় হয়ে যাবে কাজেই আমি এখানেই এর ইতি টানবো। তবে ইতি টানার আগে দু'টি কথা না বললেই নয়। একজন মানুষের এন্তেকালের সময় রেখে যাওয়া জিনিস-পত্র দেখেই ঐ মানুষটির সারা জীবনের কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। যেমন- কোনো লোকের মৃত্যুর পর তার ঘরে যদি শুধু মাত্র কয়েকটি পুরানো ইঞ্জিন, ড্রিল মেশিন, হাতুড়ি, রেঞ্জ এগুলো পাওয়া যায় তাহলে লোকটির পূর্ব পরিচয় জানা না থাকলেও লোকটি যে মোটর মিস্ত্রী বা ইঞ্জিনিয়ার ছিল তা কাউকে বলে দিতে হয় না, লোকটির মৃত্যুর সময় রেখে যাওয়া জিনিসগুলো দেখে খুব সহজেই তা বুঝা যায়। আবার কেউ যদি তার মৃত্যুর সময় তার ঘরে শুধুমাত্র হারমোনিয়াম, তবলা, ঢোল, তানপুরা ইত্যাদি কতগুলো গানের সরঞ্জাম রেখে যায় তাহলে ঐ লোকটি যে সঙ্গীতশিল্পী ছিল তাও কাউকে বলে দিতে হয় না, লোকটির সাথে কোনো পূর্ব পরিচয় না থাকলেও না। তেমনি কেউ মৃত্যুর সময় যদি শুধুমাত্র কতকগুলো যুদ্ধের সরঞ্জাম রেখে যায়, তাহলে সে যে একজন যোদ্ধা ছিল তাতেও কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

আল্লাহর শেষ রসুল ইন্তেকালের সময় পার্থিব সম্পদ বলতে রেখে যান - ১) ১টি চাটাই, ২) ১ টি বালিশ (খেজুরের ছাল দিয়ে ভর্তি) ও ৩) কয়েকটি মশক। আর রেখে যান– ১) ৯টি তরবারী, ২) ৫টি বর্শা, ৩) ১টি তীরকোষ, ৪) ৬টি ধনুক, ৫)

৭টি লৌহবর্ম, ৬) ৩টি জোব্বা (যুদ্ধের), ৭) ১টি কোমরবন্ধ, ৮) ১টি ঢাল এবং ৯) ৩টি পতাকা। (সূত্রঃ- সিরাতুন্নবী- মওলানা শিবলী নোমানী)

আল্লাহ পাক পবিত্র কোর'আনে তাঁর স্বীয় রসুলকে উদ্দেশ করে এরশাদ করেছেন, হেদায়াহ ও সত্য দীন (জীবন-ব্যবস্থা)-সহ তোমাকে প্রেরণ করেছি এই জন্য যে, সমস্ত দীনের (জীবন-ব্যবস্থা) ওপর আমার এই দীনকে বিজয়ী করে দিবে (সুরা তওবা-৩৩, ফাতহ্-২৮, সফ-৯)। আর এ বিজয়ী করার পথ হিসাবে নীতি নির্ধারণ করে দিলেন জেহাদ ও কেতাল (সশস্ত্র সংগ্রাম)। তাইতো মো'মেন হওয়ার শর্ত হিসাবে রাখলেন, জেহাদ ও কেতালকে। এজন্যই আল্লাহর রাসুল বললেন, আমি আদিষ্ট হয়েছি ততক্ষণ পর্যন্ত সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যেতে, যে পর্যন্ত না প্রত্যেকটি মানুষ আল্লাহকে তাদের একমাত্র এলাহ হিসাবে এবং আমাকে আল্লাহর রসুল হিসাবে মেনে না নেয় [আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে- বোখারী]। আর এ আদেশ পালন করতে যেয়ে আমাদের নেতা রসুলকে মাত্র ৯-১০ বৎসরে ছোট-বড় ৭৮টি যুদ্ধ করতে হয়েছে। একজন যোদ্ধা হিসাবে তাঁকে জীবন-যাপন করতে হয়েছে; অর্থাৎ তিনি একজন যোদ্ধা ছিলেন। উপরোক্ত উদাহরণগুলোর আলোকে এ সত্যের সত্যায়ন করে তাঁর রেখে যাওয়া জিনিসগুলো।

আল্লাহর রসুলের (সা.) মুখ নিঃসৃত বাণীর সাথেও রয়েছে এগুলোর অপূর্ব মিল। আল্লাহর রসুল (সা.) বলেছেন- আমি হলাম যোদ্ধা নবী, আমি হলাম দয়ার নবী (ইবনে তাইমিয়ার আস সিয়াসাহ আশ-শরীয়াহ, পৃষ্ঠা- ৮)

এ সম্বন্ধে আরও জানতে চাইলে আমার লেখা 'এ ইসলাম ইসলামই নয়' বইটি পড়া দরকার। আল্লাহ-রসুলের প্রকৃত ইসলামের যুগ অর্থাৎ সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে সত্যদীনকে কার্যকরী করে সমস্ত পৃথিবীতে ন্যায়, সুবিচার ও শান্তি (ইসলাম) প্রতিষ্ঠার যুগের পরবর্তীতে ঐ সশস্ত্র সংগ্রাম ছেড়ে দেবার পর জেহাদ, কেতালকে আত্মরক্ষামূলক বলে প্রচার চালানো হয় ও তা গৃহীত হয়। শুধু তাই নয়, এমন কি বর্তমানে এই জাতির কাছে ওটা কোনো প্রয়োজনীয় কাজ নয় বলেই বিশ্বাস করা হয়। মুসলিম বলে পরিচিত এই জাতির এখন মনে নেই যে মো'মেন হবার সংজ্ঞার মধ্যেই যে জেহাদকে আল্লাহ অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন সে জেহাদকে শুধু আত্মরক্ষামূলক বলা বা প্রয়োজন নেই মনে করলে আর মো'মেন থাকা যায় না এবং মো'মেন না থাকার মানেই হয় মোশরেক না হয় কাফের হয়ে যাওয়া যার পর আর সালাহ-সওম (নামাজ-রোযা) সহ কোনো এবাদতেরই আর কোনো অর্থ থাকে না।

আল্লাহর আরেকটি কথাও মুসলিম ও মো'মেন হবার দাবিদার এ জাতির মনে নেই, তাদের ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে যে আল্লাহ বলেছেন- তোমরা যদি (সামরিক) অভিযানে (অর্থাৎ দীনকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করার জন্য) বের হওয়া ত্যাগ করো তবে তোমাদের কঠিন শাস্তি দেব এবং তোমাদের বদলে অন্য জাতিকে মনোনীত করব; তোমরা তাঁর (আল্লাহর) কোনো ক্ষতি করতে পারবেনা (কারণ) আল্লাহ সর্বশক্তিমান (সুরা আত তওবা ৩৮-৩৯)। রসুলের (সা.) ওপর আল্লাহর অর্পিত দায়িত্ব সশস্ত্র সংগ্রাম করে সমস্ত পৃথিবীতে শান্তি (ইসলাম) প্রতিষ্ঠার জন্য বের

হয়ে পড়া ছেড়ে দিলে আল্লাহ কী করবেন বলে সাবধান করছেন তা লক্ষ্য করুন। আল্লাহ দু'টো কথা বলছেন- প্রথমটি কঠিন শাস্তি দেবেন, দ্বিতীয়টি এই জাতিকে ত্যাগ করে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠা করবেন অর্থাৎ তাদের হাতে কর্তৃত্ব দেবেন। দু'টো শাস্তিই প্রমাণ করে যে জেহাদ ত্যাগ করলে আর মো'মেন থাকা যায় না। কারণ প্রথমটি অর্থাৎ কঠিন শাস্তি আল্লাহ কখনও মো'মেনকে দেবেন না। আল্লাহ বলছেন তিনি তাঁর মালায়েকদের নিয়ে মো'মেনদের ওপর সালাম পাঠান (সুরা আহযাব- ৪৩)। যাদের ওপর আল্লাহ একা নন, তাঁর কোটি কোটি, অসংখ্য মালায়েকদেরসহ সালাম পাঠান তাদের তিনি কঠিন শাস্তি দেবেন? অবশ্যই নয়। এ ছাড়াও হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ বলছেন- আমার কাছে একজন মো'মেনের সম্মান ও মরতবা আমার কাবার চেয়েও ঊর্ধ্বে। যাদের সম্মান ও মরতবা আল্লাহর কাছে তাঁর কাবা ঘরের উর্ধে, যাদের ওপর তিনি তাঁর অসংখ্য মালায়েকদের (ফেরেশতা) নিয়ে সালাম পাঠান তাদের তিনি অবশ্যই কঠিন শাস্তি দেবেন না। তাঁর শাস্তি অর্থই এই দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতেই।

দ্বিতীয়ত তিনি বলছেন- তোমাদের বদলে অন্য জাতিকে মনোনীত করব অর্থাৎ তোমাদের পরিত্যাগ করব, তোমাদের বহিষ্কৃত করব, বিতাড়িত করব। আল্লাহ যাদের পরিত্যাগ করবেন, বহিষ্কৃত করে বাদ দিয়ে অন্য জাতি মনোনীত করবেন তারা কি আর মো'মেন থাকবে? অবশ্যই নয়। আল্লাহর প্রতিশ্রুত দু'টো শাস্তি থেকেই দেখা যাচ্ছে যে জেহাদ, সশস্ত্র সংগ্রাম ত্যাগ করলে আল্লাহ আর মো'মেন বলে গ্রহণ করবেন না। আরও লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে যে আল্লাহ কোথাও বলেন নাই যে সালাহ (নামাজ) ত্যাগ করলে বা সওম (রোযা) ত্যাগ করলে বা হজ্ব ত্যাগ করলে বা অন্য যে কোনো এবাদত ত্যাগ করলে কঠিন শাস্তি দিয়ে এই দীন থেকেই বহিষ্কৃত করবেন, শুধু জেহাদ (সংগ্রাম) এবং আল্লাহর রাস্তায় (জেহাদে) ব্যয় ছাড়া (সুরা মুহাম্মদ ৩৮)।

মুসলিম বলে পরিচিত ১৫০ কোটির এই জাতির অন্য সমস্ত জাতি দ্বারা পরাজিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত, ঘৃণিত হবার পরিপ্রেক্ষিতে আজ আমাদের পরিষ্কার করে বোঝা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে যে জেহাদ ত্যাগ করলে 'কঠিন শাস্তি' ও আমাদের 'পরিত্যাগ করে অন্য কোনোও জাতিকে মনোনীত' আল্লাহ কেন করবেন। সালাহ (নামাজ), যাকাহ, সওম (রোযা), হজ্ব ইত্যাদি দীনের হাজারো রকমের এবাদতের কোনোটাই ত্যাগ করলে একত্রে 'কঠিন শাস্তি ও তারপর বহিষ্কার' করার মতো শাস্তি আল্লাহ বলেন নি। কিন্তু জেহাদ ছাড়লে তাই দেবেন বলে জানিয়ে দিয়েছেন, সতর্ক করেছেন। কারণ হলো-

ক) মো'মেনের সংজ্ঞা অর্থাৎ মো'মেন হবার শর্তের মধ্যেই আল্লাহ ঈমানের সঙ্গে জেহাদকে অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন। কারণ দীন প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ার নীতি হিসাবে তিনি জেহাদকে, কেতালকে (সশস্ত্র সংগ্রাম) নির্ধারিত করে দিয়েছেন। জেহাদ ত্যাগ করলে মো'মেনের সংজ্ঞার মধ্যেই থাকা যায় না, আর মো'মেনের সংজ্ঞার মধ্যে না থাকলে অবশ্যই হয় মোশরেক কিম্বা কাফের। সে যতই সালাহ (নামাজ) পড়ুক, যতই সওম (রোযা) পালন করুক; আল্লাহর দৃষ্টিতে সে আর মো'মেন নয়

এবং মোশরেক আর কাফেরদের জন্য আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি অবশ্যই কঠিন, আল্লাহর বহুঘোষিত জাহান্নাম।

খ) এই জাতির বদলে অন্য কোনো জাতি মনোনীত করবেন, অর্থাৎ অন্য কোনো জাতিকে এই জাতির ওপর কর্তৃত্ব দান করবেন। কারণ পরিষ্কার- যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাঁর শেষ নবীকে পাঠিয়ে এই জাতি, উম্মাহ গঠন করলেন, এই জাতি যদি সেই উদ্দেশ্যটিকেই ছেড়ে দেয় তাহলে আল্লাহর কাছে সেই জাতির এবং অন্য কোনো এবাদতের আর কোনো প্রয়োজন থাকে না। পেছনে দেখিয়ে এসেছি যে সেই কাজটি হলো জেহাদের মাধ্যমে অন্য সমস্ত রকমের জীবন বিধানের অবসান, বিলুপ্তি ঘটিয়ে শেষনবীর মাধ্যমে ইসলামের এই শেষ বিধান, শেষ সংস্করণ পৃথিবীতে কার্যকর করে সমস্ত পৃথিবীতে শান্তি (ইসলাম) প্রতিষ্ঠা করে ইবলিসের চ্যালেঞ্জে ইবলিসকে পরাজিত করে আল্লাহকে জয়ী করা। ঈমানের অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রসুলের ওপর সর্বব্যাপী বিশ্বাস আনার পরই যে কাজটি নির্ধারিত করা হয়েছে তা হলো জেহাদ, এই দীনকে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রাম (সুরা হুজরাত ১৫)। সেই কাজটি ছেড়ে দিলে এ জাতির অস্তিত্ব থাকারই আর প্রয়োজন থাকে না; তাই আল্লাহ এ জাতিকে সতর্ক করে দিয়েছেন জেহাদ ছেড়ে দিলে তাকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে অন্য জাতিকে অধিকার ও কর্তৃত্ব দেবেন।

আল্লাহ যে শুধু ভয় দেখানোর জন্যই এই জাতিকে এই কথা বললেন তা যে নয়, তার প্রমাণ হলো পরবর্তী ইতিহাস। সে ইতিহাস হচ্ছে এই যে, জাতিগতভাবে জেহাদ ছেড়ে দেবার শাস্তি হিসাবে ইউরোপের বিভিন্ন খ্রিষ্টান রাষ্ট্রগুলোকে দিয়ে আটলান্টিক মহাসমুদ্রের তীরে মরোক্কো থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের ফিলিপাইন পর্যন্ত সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে সামরিকভাবে পরাজিত করে খ্রিষ্টানদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করে দিলেন, অর্থাৎ সমস্ত মুসলিম দুনিয়াকে খ্রিষ্টানদের গোলামে, দাসে পরিণত করে দিয়ে তাঁর হুশিয়ারি, প্রতিশ্রুতি পালন করলেন। এই সরাসরি দাসত্বের বাইরে রইলো শুধু হেজাজ, আল্লাহর ঘর কাবা এবং তাঁর রসুলের (সা.) পবিত্র রওযা। খ্রিষ্টান শক্তিগুলো যদি ওগুলোও দখল করতে চাইত তবে বাধা দেবার শক্তি একদা অপরাজেয় এই জাতির ছিল না। আমার মতে আল্লাহ শুধু মধ্য আরবটুকু খ্রিষ্টানদের হাতে তুলে দিলেন না তাঁর নিজের ঘর এবং তাঁর হাবিবের রওযার সম্মানে। যারা ইতিহাস পড়েছেন তারা উপলব্ধি করবেন যে ইউরোপের খ্রিষ্টান শক্তিগুলো যখন এই মুসলিম উম্মাহকে সামরিকভাবে পরাজিত করে কয়েকশ' বছর তাদের ওপর প্রভুত্ব করেছে তখন আল্লাহর সতর্কবাণী- "তোমাদের কঠিন শাস্তি (আযাবুন আলীমা) দেব" কেমন করে সত্য হয়েছে। তাদের সামরিক আক্রমণ, যুদ্ধ ও শাসনকালে সমস্ত মুসলিম দুনিয়ায় তারা এই জাতিকে গুলি করে, বেয়োনেট দিয়ে বিদ্ধ করে, আগুনে পুড়িয়ে, লাইন করে দাঁড় করিয়ে মেশিনগান করে, জীবন্ত কবর দিয়ে, ট্যাংকের তলায় পিষে হত্যা করেছে, এই জাতির মেয়েদের ধরে নিয়ে ইউরোপে, আফ্রিকায় ও বিভিন্ন দেশের বেশ্যালয়ে বিক্রি করেছে; জেল, ফাঁসির তো কথাই নেই। আল্লাহর ঐ শাস্তি আজও শেষ হয় নাই। আজ ইউরোপীয় খ্রিষ্টানদের সরাসরি শাসন নেই কিন্তু এই জাতি আজও রাজনৈতিক, কুটনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, শিক্ষা,

আইন-কানুন, দণ্ডবিধি এক কথায় সর্বতোভাবে ইউরোপ-আমেরিকার দাস হয়েই আছে। আজও এই জাতি শুধু ইউরোপে নয়, পৃথিবীর সমস্ত জাতিগুলো দিয়ে পরাজিত, অপমানিত, লাঞ্ছিত হচ্ছে। এই জাতি তার প্রভু আল্লাহর সতর্কবাণীর অর্থ আজও বোঝে নাই; আজও জেহাদ বিমুখ হয়ে হাজারো রকমের 'এবাদত' নিয়ে মশগুল আছে। আজও সে মো'মেনের সংজ্ঞায় ফিরে যায় নি, এবং আজও আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক সেই শাস্তি দিয়েই চলেছেন এবং আখেরাতে জাহান্নামে আরও কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন, কোনো নামাজ, রোযা, হজ্ব, যাকাত সে আযাব থেকে বাঁচাতে পারবে না।

এখন আমরা নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে যেহেতু মো'মেন হবার সংজ্ঞা ও শর্তের মধ্যে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের ওপর সর্বব্যাপী বিশ্বাসের (ঈমান) সঙ্গে জেহাদকে অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন (সুরা হুজরাত, আয়াত ১৫), জেহাদকে ফরদে আইন করে দিয়েছেন (সুরা বাকারা ২১৬), সরাসরি সশস্ত্র সংগ্রামের হুকুম দিয়েছেন (সুরা বাকারা ২৪৪, সুরা আনফাল ৩৯ এবং কোর'আনের আরও অনেক স্থানে) ছয়শ' বাইশ বারেরও বেশি সশস্ত্র সংগ্রাম, কেতাল, যুদ্ধ সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন, যুদ্ধ করে জীবন বিসর্জন যে দেবে তার জন্য এই দীনের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার ও সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যেহেতু জেহাদ ত্যাগ করলে আল্লাহ ভয়াবহ শাস্তি দিয়ে বিতাড়িত করবেন, বহিষ্কৃত করবেন বলে হুশিয়ার করেছেন (সুরা তওবা ৩৮-৩৯), সেহেতু এই দীনের মধ্যে প্রবেশ করতেই একজন মানুষকে যোদ্ধা হতে হবে, যোদ্ধা না হয়ে কেউ এই দীনে প্রবেশই করতে পারবে না। অর্থাৎ যে যোদ্ধা নয় এই দীনুল ইসলামের একজন প্রাথমিক সদস্য হওয়ারও যোগ্যতা তার নেই। ভালো বা উচ্চস্তরের সদস্য হওয়া তো দূরের কথা। এক কথায় বলা যায় যে এই শেষ ইসলামে প্রবেশ করার জন্য, আল্লাহর কাছে মো'মেন বলে গৃহীত হবার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসুলের ওপর ঈমানের (বিশ্বাস) সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে একজন নির্ভীক দুর্জয় যোদ্ধায় রূপান্তরিত করতে হবে এবং নিজের প্রাণ ও পার্থিব সম্পদ দিয়ে সশস্ত্র সংগ্রাম করতে হবে; নইলে কোনো লোক মো'মেন বলে আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে না, সে যত বড় মুত্তাকি (পরহেযগার)-ই হোক।

আল্লাহ তাঁর রসুলকে হুকুম দিলেন- পৃথিবীতে প্রচলিত সব রকম জীবন-ব্যবস্থাকে (দীন) নিষ্ক্রিয়, অচল করে দিয়ে আমার দেয়া এই সঠিক দিক নির্দেশনা ও সত্যদীনকে প্রতিষ্ঠা করো; এজন্যই তোমাকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে (সুরা তওবা ৩৩, সুরা ফাতাহ ২৮, সুরা সফ ৯)। এ কাজ কেমন করে, কী প্রক্রিয়ায় তাঁর রসুল করবেন তাও তিনি তাঁকে জানিয়ে দিলেন- এ কাজের নীতি হিসাবে তিনি নির্দিষ্ট করে দিলেন; ইনিয়ে বিনিয়ে অনুরোধ করে নয়; এই দিক নির্দেশনা ও সত্যদীন যে অন্যান্য জীবন-ব্যবস্থার (দীন) চেয়ে উৎকৃষ্ট এ কথা প্রমাণ করার চেষ্টা করে নয়, মিটিং-মিছিল করে নয়, নির্বাচন করে নয়, দেয়ালে প্রচার পত্র সেটে নয়, শ্লোগান দিয়ে নয়, যুক্তি-তর্ক করে নয়, তাবলিগ, প্রচার করে নয়; জেহাদ ও কেতাল, সংগ্রাম ও সশস্ত্র সংগ্রাম করে। আরও বললেন- তোমার জাতিকে, উম্মাহকে, মো'মেনদের যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করো (সুরা আনফাল ৬৫)। আদেশ পেয়ে আল্লাহর রসুল (সা.) বললেন- আমি আদেশ পেয়েছি পৃথিবীর মানুষের

বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করে যেতে যে পর্যন্ত না সমস্ত পৃথিবীর মানুষ আল্লাহর তওহীদ ও আমাকে আল্লাহর রসুল বলে স্বীকার করে নেয় [হাদিস- আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রা.) থেকে বোখারী, মেশকাত]। আল্লাহর এই আদেশ বাস্তবায়ন করতে যেয়ে তাঁর রসুল এক দুর্ধর্ষ মৃত্যুভয়হীন, অজেয় বাহিনী গঠন করলেন যার নাম উম্মতে মোহাম্মদী এবং ঐ বাহিনী নিয়ে মাত্র সাড়ে নয় বছরের মধ্যে ৭৮টি যুদ্ধ করে সমস্ত আরব উপদ্বীপে আল্লাহর দেয়া সঠিক দিক নির্দেশনা ও সত্যদীন প্রতিষ্ঠা করে ইসলাম (শান্তি) প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁর সংগঠিত উম্মতে মোহাম্মদীও বুঝেছিল, শুধু বুঝেছিল নয়, হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছিল তাদের কর্তব্য কী, উদ্দেশ্য কী, কেন তাদের আল্লাহর রসুল (সা.) সংগঠিত করেছিলেন। তাই রসুলের (সা.) পৃথিবী থেকে চলে যাবার পর তাঁর উম্মাহ তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষেত-খামার, দোকান-পাট, স্ত্রী-পুত্র, পরিবার-পরিজন এক কথায় পার্থিব সব কিছু ত্যাগ করে অস্ত্র হাতে পৃথিবীতে বের হয়ে পড়েছিলেন তাদের নেতার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে। আল্লাহর সেই কঠোর ধমকি, সতর্কবাণী সর্বদা তাদের মনে ভয় জাগরিত, ভীত করে রাখতো যে আল্লাহ বলেছেন- তোমরা জেহাদের অভিযানে বের হওয়া ত্যাগ করলে তোমাদের কঠিন শাস্তি দেব এবং তোমাদের বদলে অন্য জাতিকে মনোনীত করব; তোমরা তাঁর (আল্লাহর) কোনো ক্ষতি করতে পারবে না (কারণ) আল্লাহ সর্বশক্তিমান (সুরা তওবা- ৩৮, ৩৯)।

এখন দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে সশস্ত্র সংগ্রাম করে পৃথিবীতে আল্লাহর দেয়া দিক নির্দেশনা ও সত্যদীনকে প্রতিষ্ঠার মতো বিশাল ও কঠিন কাজের জন্য আল্লাহর হুকুমে তাঁর রসুল যে বাহিনী গঠন করলেন, যার নাম হলো উম্মতে মোহাম্মদী তার চরিত্র গঠন ও প্রশিক্ষণের জন্য কী ব্যবস্থা করা হলো? এটি হতে পারে না যে আল্লাহ তাঁর রসুলকে উম্মাহ গঠন করতে আদেশ দিলেন, যুদ্ধকে ফরদে আইন করে দিলেন, পৃথিবীতে দীন প্রতিষ্ঠার নীতি ও প্রক্রিয়া হিসাবে যুদ্ধকেই নির্দিষ্ট করে দিলেন, কিন্তু তাদের জন্য যুদ্ধের কোনো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা দিলেন না। যে কথাটি সাধারণ জ্ঞানেই বোঝা যায় যে কোনো কাজ করতে গেলেই সেই কাজের প্রশিক্ষণ অত্যাবশ্যক, আল্লাহ সোবহানাহু তায়ালা কি এই কথাটি বোঝেন নি? তাহলে এই দীনে সেই প্রশিক্ষণ কোথায়? প্রত্যেক জাতিরই সামরিক বাহিনী আছে এবং প্রত্যেকেরই যুদ্ধের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। তাদের দৈনিক প্যারেড, কুচকাওয়াজ, অস্ত্রের ব্যবহারের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। ওগুলো ছাড়া কোনো সামরিক বাহিনী নেই। তাহলে আল্লাহর রসুল (সা.) যে সামরিক বাহিনী গঠন করলেন, যে বাহিনী যুদ্ধ করে ৯ বছরের মধ্যে সমস্ত আরব উপদ্বীপ জয় করলো, তারপর মাত্র ৬০/৭০ বছরের মধ্যে তৎকালীন পৃথিবীর দুই বিশ্বশক্তির সুশিক্ষিত বিশাল সামরিক বাহিনীগুলোকে যুদ্ধে পরাজিত করে অর্ধেক পৃথিবীতে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করলো তারা এ সব কিছু প্রশিক্ষণ ছাড়াই করলো? এ হতে পারে? অবশ্যই নয়। একথা সাধারণ জ্ঞানেই বোঝা যায় যে, যে দীনে, জীবন-ব্যবস্থায় যুদ্ধকে ফরদে আইন, অবশ্য করণীয় করে দেয়া হয়েছে (সুরা বাকারা ২১৬) সে দীনে প্রশিক্ষণকেও অবশ্য করণীয়, ফরদে আইন করে দেয়া হবে। আল্লাহ ভুল

করেন নি, তিনি সোবহান, তিনি সামান্যতম ভুলও করতে পারেন না, আর এতবড় ভুল তো কথাই নেই।

তাহলে সে প্রশিক্ষণ কোথায়?

সেই মহাগুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ হলো- সালাহ

সালাতের উদ্দেশ্য কী? বিশ্বনবী আল্লাহর নির্দেশে যে উম্মাহ, জাতি গঠন করলেন যে জাতিটাকে একটি জাতি না বলে একটি সামরিক বাহিনী বলাই সঠিক হয়, সেই জাতির আকিদাতে সালাতের উদ্দেশ্য ও অর্থ সঠিক ছিল; অর্থাৎ সেই জাতির, সেই বাহিনীর একজন হতে গেলে যে চরিত্রের প্রয়োজন সেই চরিত্র গঠনের প্রশিক্ষণ হচ্ছে এই সালাহ। সালাহ সম্বন্ধে এই সঠিক আকিদা চালু ছিল যত দিন এই বাহিনী নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধ করে গেছে; অর্থাৎ রসুলের (সা.) পর ৬০/৭০ বছর পর্যন্ত। তারপর এই উম্মাহর শাসকরা আল্লাহর আদেশ ও সাবধান বাণী ভুলে যেয়ে যখন সশস্ত্র সংগ্রাম ত্যাগ করে মো'মেন মোজাহেদের প্রাণ, সম্পদ ও রক্তের বিনিময়ে প্রাপ্ত বিশাল এলাকা অন্যান্য রাজা-বাদশাদের মতো ভোগ করতে বসলেন, আলেমরা, পণ্ডিতরা কোর'আনের আয়াতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে খাতা কলম নিয়ে ঘরে ঢুকলেন, আর তাসাওয়াফপন্থীরা অস্ত্র ফেলে দিয়ে তসবিহ নিয়ে নফ্স্ পরিষ্কার করতে হুজরায়, খানকায় ঢুকলেন তখন স্বভাবতই প্রয়োজন হয়ে পড়লো নবীর শেখানো এই দীনের আকিদার কতকগুলো পরিবর্তন করা। তাদের মনে রইলনা যে তারাই বলেছেন যে আকিদা সঠিক না হলে, ভুল হলে ঈমান, আমল, কিছুরই আর অর্থ থাকে না। পরিবর্তন করাও হলো এবং ঐ পরিবর্তনের ফলে এই সামরিক দীন পৃথিবীর অন্যান্য অসামরিক দীনের পর্যায়ে পর্যবসিত হলো অর্থাৎ খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু, ইহুদি, জৈন ইত্যাদি বহু দীনের (ধর্মের) মতো আরেকটি ধর্মে পরিণত হলো যেটার উদ্দেশ্য এবাদত, পূজা, উপাসনা করে আত্মার চর্চা করা; রসুল যে সুশৃঙ্খল, মৃত্যুভয়হীন দুর্ধর্ষ যোদ্ধার চরিত্রের সৃষ্টি করেছিলেন তার বদলে ষড়রিপুজয়ী ভীরু কাপুরুষ সাত্ত্বিকের দল তৈরি করা। সুতরাং অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রশিক্ষণ সালাহ বদলে হয়ে গেল এবাদত, উপাসনা, ধ্যান করা, রসুলের (সা.) সুন্নাহ তাঁর ১০ বছরে ৭৮ টি যুদ্ধ থেকে বদলে হয়ে গেল দাড়ি রাখা, গোফ ছাটা, দাঁত মেসওয়াক করা, মিষ্টি খাওয়া, কুলুখ নেয়া, খানকায় ঢুকে তসবিহ জপা, মোরাকাবা, মোশাহেদা করা ইত্যাদি। এ বিষয়ে সম্যক ধারণার জন্য আমার লেখা "এ ইসলাম ইসলামই নয়" বইটি পড়া প্রয়োজন।

আশ্চর্য লাগে, সালাতের উদ্দেশ্যকে কী করে অন্যান্য ধর্মের উপাসনার সাথে এক করে ফেলা হলো, কারণ অন্যান্য ধর্মের উপাসনার পদ্ধতিগুলো থেকে সালাতের প্রক্রিয়া পদ্ধতি শুধু ভিন্ন নয়, একেবারে বিপরীত। অন্যান্য ধর্মের পদ্ধতিগুলো অন্তর্মুখী, জড়; কোনোটি পদ্মাসনে বসে চোখ বন্ধ করে ধ্যান করা, কোনোটি জোড় হাতে হাটু গেড়ে বসে চোখ বন্ধ করে স্রষ্টাকে ধ্যান করা, কোনোটি সংসার ত্যাগ করে বনে যেয়ে সাধনা করা, কোনোটি নির্জন স্থানে বা বদ্ধ ঘরে স্থির হয়ে বসে প্রভুর ধ্যান করা ইত্যাদি নানা প্রকারের; আর সালাতে সবাই একত্র হয়ে সোজা লাইন করে দাঁড়িয়ে শরীর, মেরুদণ্ড, ঘাড় দৃঢ়ভাবে লোহার রডের মতো

অনমনীয় রেখে নেতার আদেশের (তকবীর) সঙ্গে সঙ্গে রুকু, সাজদা, সালাম ইত্যাদি করা। এই বিপরীতমুখী দু'টি জিনিসকে, যেটা সাধারণ জ্ঞানেই বোঝা যায় যে বিপরীত, সে দু'টোকে একই জিনিস মনে করা কী করে সম্ভব! কিন্তু আবার চিন্তা করলে আশ্চর্য লাগে না; কারণ জেহাদ ত্যাগ করলে আল্লাহ যে শাস্তি দেবেন বলে সাবধান করেছেন তা হলো কঠিন শাস্তি ও আমাদের বহিষ্কৃত, বিতাড়িত, করে অন্য জাতিকে মনোনীত করা। জেহাদ ত্যাগ করার ফলে আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক মুসলিম বলে পরিচিত এই জাতিকে কঠিন শাস্তি দিয়ে অন্য জাতি অর্থাৎ ইউরোপের খ্রিষ্টান জাতিগুলোকে এই জাতির প্রভু বানিয়ে দিলেন। তাঁর 'কঠিন শাস্তির' মধ্যে বহুবিধ শাস্তির মধ্যে এও একটি যে জাতির সাধারণ জ্ঞানও লোপ পাবে। তাই হয়েছে; নইলে সামরিক বাহিনীর প্যারেড, কুচকাওয়াজের মতো একটি কাজকে অন্যান্য ধর্মের স্থবির উপাসনার সঙ্গে এক করে ফেলা কী করে সম্ভব!

কেতাল অর্থাৎ যুদ্ধকে যেমন আল্লাহ ফরদে আইন করে দিয়েছেন (সুরা বাকারা-২১৬), তেমনি আল্লাহ সালাহকেও ফরদে আইন করে দিয়েছেন আমাদের জন্য। কারণ যুদ্ধ প্রশিক্ষণ ছাড়া অসম্ভব। কিন্তু সালাতের প্রশিক্ষণ শুধু আমাদের যুদ্ধ শেখায় না, সালাহ চারিত্রিক, দৈহিক, মানসিক, আত্মিক, আধ্যাত্মিক বহু প্রকারের শিক্ষা দেয় যদিও যুদ্ধের প্রশিক্ষণটাই প্রথম ও মুখ্য। সালাতের দৃশ্য পৃথিবীতে আর একটি মাত্র দৃশ্যের সঙ্গে মিলে, আর কিছুর সাথেই মিলে না, আর সেটা হচ্ছে পৃথিবীর যে কোনো সামরিক বাহিনীর কুচকাওয়াজের সঙ্গে। এই সাদৃশ্য এতই প্রকট যে বর্তমানের এই প্রায়ান্ধ ইসলামের দৃষ্টিতেও তা ধরা পড়ে। যেমন ডিগ্রী ইসলামিক স্টাডিজের (Degree Islamic Studies) তৃতীয় প্রত্রের অনুশীলনের ৬ষ্ঠ প্রশ্নের ১৮নং উত্তরে লেখা হচ্ছে– "মসজিদ নেতৃত্ব ও নেতার আনুগত্যের শিক্ষা দেয়: মসজিদ নেতৃত্ব ও আনুগত্যের এক অনুপম শিক্ষা কেন্দ্র। মসজিদ সব মুসল্লির একই এমামের পেছনে সারিবদ্ধভাবে উঠাবসা দৃশ্য দেখে মনে হয় তারা একজন সেনাপতির নির্দেশে কুচকাওয়াজে লিপ্ত। এখানেই নেতার প্রতি অকৃত্রিম আনুগত্য ও নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্যের উত্তম সবক বিদ্যমান।" এই মিল স্বাভাবিক, কারণ দু'টোরই উদ্দেশ্য এক- 'যুদ্ধ'। শুধু তফাৎ এই যে কেন যুদ্ধ? পৃথিবীর সব সামরিক বাহিনীগুলোর প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের ভৌগোলিক রাষ্ট্রগুলোর রক্ষা এবং রাষ্ট্রের স্বার্থের প্রয়োজনে অন্য রাষ্ট্রকে আক্রমণ করে দখল করা; আর এই উম্মতে মোহাম্মদীর প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হচ্ছে- সশস্ত্র সংগ্রাম করে সমস্ত পৃথিবীতে আল্লাহর তওহীদ-ভিত্তিক দীন কার্যকর করে মানবজাতির মধ্যকার সমস্ত অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার, অশান্তি, রক্তপাত দূর করে শান্তি (ইসলাম) প্রতিষ্ঠা করে ইবলিসের চ্যালেঞ্জে তাকে পরাজিত করে আল্লাহকে জয়ী করা। উদ্দেশ্যের মধ্যে আসমান-জমিন তফাৎ থাকলেও প্রক্রিয়া দু'টোরই এক- প্রশিক্ষণ। আকিদার বিকৃতির কারণে সালাহ-কে শুধু একটি এবাদত, একটি আত্মশুদ্ধির প্রক্রিয়া হিসাবে নেয়া যে কতখানি আহাম্মকী তার কয়েকটি কারণ পেশ করছি।

১। আত্মশুদ্ধির জন্য প্রয়োজন পাহাড়-পর্বতের গুহায় না হয় হুজরায়-খানকায় অন্ততপক্ষে কোনো নির্জন স্থান, যেখানে স্থির হয়ে বসে, চোখ বন্ধ করে মন নিবিষ্ট

করে, একাগ্রচিত্ত হয়ে আল্লাহর ধ্যান করা। সালাতের প্রক্রিয়া এর প্রত্যেকটারই একেবারে বিপরীত। নির্জন স্থানে না হয়ে সালাতের জন্য স্থান নির্ধারণ আল্লাহ করেছেন জামাতে, জনসমাবেশে এবং সে সমাবেশ যত বড় হবে তত সওয়াব, তত পুণ্য; অর্থাৎ একেবারে বিপরীত। একা সালাহ কায়েম করা শুধুমাত্র ব্যতিক্রম, যেখানে জামাতে যোগদান সম্ভব নয়; এবং তাও ঐ প্রশিক্ষণের অভ্যাস ঠিক রাখার উদ্দেশ্যে।

ইতোপূর্বে আমি বলে এসেছি, সালাহ দৈহিক এবং আত্মিক এই উভয়েরই সংস্কার এবং উন্নয়নের প্রক্রিয়া এবং প্রশিক্ষণ। জামাতবদ্ধ সালাতে এই উভয় উদ্দেশ্যই সাধিত হয়। একা একা সালাহ কায়েম করলে এর শুধু ব্যক্তিগতভাবে আত্মিক উন্নতি হয়। কাজেই প্রকৃতপক্ষে ফরদ সালাহ শুধুমাত্র দলবদ্ধভাবে অর্থাৎ জামাতে করাই সঠিক। জামাতে সালাহ কায়েম করা অসম্ভব হলে শুধুমাত্র তখন ফরদ সালাহ একা একা কায়েম করা কর্তব্য। এজন্যই অনেক হাদীসেই আমরা পাই যে, ফরদ সালাহ জামাতে কায়েম করা একা কায়েম করার চেয়ে বহুগুণ বেশি সওয়াব।

২। লাইন করে দাঁড়াতে হবে এবং সে লাইন হতে হবে ধনুকের ছিলার মতো সোজা, ধনুকের ছিলার চেয়ে সোজা আর কোনো জিনিস নেই, হতে পারে না। লাইন যদি ধনুকের ছিলার মতো সোজা না হয় তবে যারা সালাহ পড়ছে তাদের ঘাড়, মুখ আল্লাহ উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দেবেন (শাস্তি হিসাবে) [হাদিস- নোমান বিন বশীর (রা.) থেকে মুসলিম এবং আবু মাসউদ আল আনসারী (রা.) থেকে মুসলিম, মেশকাত]। সালাতের লাইন ধনুকের ছিলার মতো সোজা করার জন্য আল্লাহর রসুলের (সা.) অনেকগুলো হাদিস আছে।

ধনুকের ছিলার মতো সোজা লাইন করেও দুই তিন রাকাত সালাহ কায়েম করার পর অর্থাৎ দু' তিন বার ওঠাবসা করার পর ঐ সোজা লাইন আঁকা-বাঁকা হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে এবং অনেক সময় হয়ও। এটি যাতে না হয় সালাতের শেষ পর্যন্ত যেন লাইন একদম শুরুর মতই সোজা থাকে সে জন্য রসুলের (সা.) দেয়া নিয়ম হচ্ছে এই যে লাইন ধনুকের ছিলার মতো সোজা করে সালাহ আরম্ভ করা থেকে শেষ পর্যন্ত ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি (বুড়া আঙুল) এক স্থানে নিবদ্ধ রাখতে হবে– শুধু ডান পায়ের। অর্থাৎ সালাতের আরম্ভের সময় ডান পায়ের বুড়া আংগুল যে জায়গায় থাকবে সেখান থেকে একচুল নড়বে না– মাটিতে খোঁটা গাড়লে যেমন খোঁটা আর সেখান থেকে নড়ে না, তেমনি সালাতের ওঠাবসার সময়ও ডান পায়ের বুড়া আংগুল খোঁটার মতো এক জায়গায় নিবদ্ধ রাখতে হবে। তাহলেই সালাতের সোজা লাইন আর একটুকুও আঁকাবাঁকা হবে না। এটি করতে হবে প্রত্যেক মুসল্লির, মোজাহিদের। যার বুড়া আংগুল খোঁটার মতো এক জায়গায় নিবদ্ধ থাকবে না সে লাইন থেকে হয় সামনে না হয় পেছনে সরে যাবে, এবং লাইন আঁকাবাঁকা হয়ে যাবে এবং শাস্তি হিসাবে আল্লাহ ঐ সব মুসল্লিদের ঘাড়, মাথা পেছন দিকে ঘুরিয়ে দেবেন।

৩। আল্লাহর রসুল (সা.) বলেছেন- পিঠ এমনভাবে সোজা করে দাঁড়াবে যাতে সমস্ত হাড়ের গাইটগুলো আপন আপন জায়গায় বসে যায় [রেফায়াহ বিন রা'ফে

বিন মালেক (রা.) থেকে এমাম ইবনে হিব্বান, এমাম মাহমুদ]। রুকুতে যেয়ে দুই হাত দিয়ে হাটু এমনভাবে ধরবে যেমন করে বাজপাখি শিকার ধরে এবং মাজা থেকে মাথা পর্যন্ত একদম এক লাইনে থাকবে, মাথা ঐ সরলরেখা থেকে উঁচুও হবে না, নিচুও হতে পারবে না [আবু হুমায়েদ সাঈদী (রা.) থেকে- আবু দাউদ, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ এবং আয়েশা (রা.) থেকে মুসলিম]।

৪। আল্লাহর রসুল (সা.) এরশাদ করেছেন যে- যে ব্যক্তি রুকু হতে দাঁড়িয়ে পিঠ সোজা করে না, আল্লাহ তাঁহার সালাতের প্রতি দৃষ্টিপাতও করেন না [আবু হোরায়রা (রা.)]। আল্লাহর রসুল (সা.) শরীর, পিঠ ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একদম সোজা রাখা সম্বন্ধে এতবার বলেছেন যে তা থেকে এর গুরুত্ব বোঝা যায়। কিন্তু বর্তমানের প্রচলিত সালাতে, যাকে নামাজ বলা হয়, এর কোনো গুরুত্বই নেই। শরীর পিঠ ইত্যাদিকে রডের মতো সোজা রাখার জন্য আল্লাহর রসুল (সা.) যে প্রক্রিয়াটার ওপর জোর দিয়েছেন তা হলো, সমস্ত হাড়ের গ্রন্থীগুলো (Joint) আপন আপন জায়গায় সোজা হয়ে বসে যায়। কেউ যদি নিজের পিঠের, মেরুদণ্ডের জোড়া, গাইটগুলো আপন আপন জায়গায় বসিয়ে দেয় তবে অবশ্যই তার পিঠ নিজে থেকেই রডের মতো সোজা হয়ে যাবে, তেমনি তার ঘাড়ও সোজা হয়ে যাবে এবং রুকুতে ও বসা অবস্থায় দুই হাত যখন হাটুর ওপর স্থাপন করা হবে তখন দুই বাহু একেবারে রডের মতো সোজা হয়ে যাবে। এবং সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এই কঠিন সোজা অবস্থাই আল্লাহ ও তাঁর রসুল মুসল্লির সালাতে চান। শরীরের গ্রন্থী, গাইট (Joint) গুলোকে যথাস্থানে শক্তভাবে বসাবার ব্যাপারে এত বিভিন্ন হাদিস আছে যে সবগুলো পূর্ণভাবে উল্লেখ করতে গেলে এই বই অনেক বড় হয়ে যাবে। কাজেই এখানে আমি শুধু তাদের নামগুলো এখানে উল্লেখ করছি। তারা হলেন– রেফায়াহ বিন রা'ফে বিন মালেক থেকে এমাম ইবনে হিকাম, এমাম মাহমুদ; আবু দাউদ, বায়হাকী; হাকীম; বোখারী; মুসলিম; আবু হোরায়রা; আলী বিন শায়বান থেকে ইবনে মাজাহ; আনাস থেকে আবু দাউদ; দারেমী, হাকিম, শাফিয়ী।

৫। আল্লাহর রসুল (সা.) বলেছেন- হে মুসল্লিগণ শোন, যে ব্যক্তি রুকু ও সাজদাতে মেরুদণ্ড সোজা করবে না তাহার সালাহ হবে না [আলী বিন শায়বান (রা.) থেকে ইবনে মাজাহ]। সাজদা অবস্থায় পিঠের মেরুদণ্ড একদম সোজা এবং পায়ের আংগুলগুলো কেবলামুখী করে রাখতে হবে। রুকতে দুই হাত সোজা করে দুই হাঁটুর ওপর দৃঢ়ভাবে রাখতে হবে এবং পিঠ সোজা রাখতে হবে [আবু হুমায়েদ সাঈদী (রা.) থেকে- বোখারী, আবু দাউদ, তিরিমিযি, ইবনে মাজাহ]।

৬। আল্লাহর রসুল (সা.) বলেছেন- লাইন সোজা কর (ধনুকের ছিলার মত), সোজা হয়ে দাঁড়াও, তোমাদের ঘাড় সোজা রাখ [আনাস (রা.) থেকে- আবু দাউদ]।

৭। আল্লাহর রসুল (সা.) বলেছেন- লাইন সোজা কর, তোমাদের বাহুমূল (কাঁধ) সম পর্যায়ে রাখ, ফাঁকসমূহ পূর্ণ কর [ইবনে উমর (রা.) থেকে আবু দাউদ]।

ইসলামের প্রকৃত সালাহ যে কতখানি সামরিক শৃঙ্খলা (Military Dicipline) শেখায় তা ফুটে ওঠে এর নিষেধগুলোর মধ্যে।

১। সাজদার স্থান থেকে ফুঁ দিয়ে ধুলাবালি সরানো বা সেখান থেকে পাথর কুচি বা কাঁকর হাত দিয়ে সরানো নিষেধ [উম্মে সালমাহ (রা.) ও আবু যর গিফারি (রা.) থেকে আহমদ তিরমিযি, আবু দাউদ নেসায়ী ও ইবনে মাজাহ]।

২। চোখ বন্ধ করে রাখা, এদিক ওদিক তাকানো, কাপড় বা মাথার চুল ঠিকঠাক করা জায়েজ নয় (বোখারী)।

৩। ঐ ধনুকের ছিলার মতো লাইনে দাঁড়াতে হবে একজন সৈনিকের মতো শরীর, পিঠ, মেরুদণ্ড, ও ঘাড় শক্ত, সোজা করে। পিঠ, মেরুদণ্ড ও ঘাড় যদি সোজা, একই সরলরেখায় না থাকে তবে সালাহ ক্ষতিগ্রস্ত হবে, নষ্ট হবে। হাই তোলা যথাসম্ভব রোধ করবে [আবু হোরায়রা (রা.) থেকে তিরমিযি]।

৪। চোখের দৃষ্টি নির্দিষ্ট স্থানে নিবদ্ধ রাখতে হবে, নড়াচড়া করা যাবে না। চোখ খুলে রাখতে হবে, বন্ধ করা যাবে না।

৫। সালাতের জন্য টুপি পরিধান করা বা পাগড়ী বাঁধা প্রয়োজনীয় নয় (বোখারী)।

৬। দাঁড়ানোর সময় দু'পায়ে সমান ভর রাখতে হবে, কোনো এক পায়ে বেশি ভর দেয়া যাবে না।

৭। সালাহ দ্রুত হতে হবে।

৮। আল্লাহর রসুল (সা.) উচ্চৈঃস্বরে সালাতের তকবির দিতেন [আবু সাঈদ খুদরি (রা.) থেকে- বোখারী]। তিনি তকবির বলার সময় স্বর উচ্চ করতেন যাতে সব মোকতাদিরা শুনতে পায়– আহমদ, হাকিম ও যাহাবী।

৯। সালাতের প্রত্যেক রোকন অর্থাৎ রুকু, সাজদা, কওমা ইত্যাদি ধীরে আদায় করতে হবে, না হলে সালাহ হবে না (বোখারী)।

এখানে বুঝতে হবে যে সালাতের রোকনগুলো ধীরে আদায় করার অর্থ কী? এ ব্যাপারে বর্তমান মুসলিম বলে পরিচিত জনসংখ্যার মধ্যে ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। প্রচলিত ধারণা হচ্ছে এই যে ধীরে ধীরে নড়াচড়া, ওঠবোস করতে হবে। মোটেই তা নয়। যেহেতু মূলত সালাহ সামরিক প্রশিক্ষণ সেহেতু এর চলন (Movement) দ্রুত হতে বাধ্য। হাদীসের ধীর শব্দ প্রযোজ্য হচ্ছে ঐ দ্রুত চলনের মধ্যকার সময়ের, অর্থাৎ রুকুতে যাবার সময় দ্রুত, কিন্তু রুকুতে অর্থাৎ রুকু অবস্থায় যথেষ্ট সময়ক্ষেপণ করা। রুকু থেকে দ্রুত উঠে দাঁড়ান অবস্থায় যথেষ্ট সময় দেরি করা, দ্রুত সাজদায় যেয়ে সাজদায় যথেষ্ট সময় দেয়া, সাজদা থেকে দ্রুত উঠে বসা অবস্থায় আবার বেশ খানিকক্ষণ সময় দিয়ে তারপর আবার সাজদায় যাওয়া, এবং দ্রুত যাওয়া, কিন্তু সাজদায় যেয়ে সাজদা অবস্থায় বেশ সময় দেয়া ইত্যাদি।

আমার কথার প্রমাণ এই সহীহ হাদিসটি– আল্লাহর রসুল (সা.) যখন 'সামিআল্লাহু লেমান হামিদাহ' বলে রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন তখন এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন যে আমরা মনে করতাম যে তিনি সাজদায় যাওয়ার কথা ভুলেই গিয়েছেন এবং এক সাজদার পর বসা অবস্থায় এতক্ষণ দেরি করতেন যে আমরা

মনে করতাম যে তিনি দ্বিতীয় সাজদার কথা ভুলে গিয়েছেন। কিন্তু তিনি ঠিকই 'আল্লাহু আকবার' বলে দ্বিতীয় সাজদায় যেতেন [আনাস (রা.) থেকে- বোখারী, মুসলিম, আহমদ]।

রুকু থেকে দাঁড়িয়ে এবং দুই সেজদার মাঝখানে আল্লাহর রসুলের এত দেরি করার কারণ কী? এর কারণ হচ্ছে, রুকু থেকে দাঁড়িয়ে মুসল্লি খেয়াল করবে যে তার দাঁড়ানো লোহার রডের মতো সোজা হয়েছে কি না, তার ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলী খুঁটার মতো এক স্থানে নিবদ্ধ আছে কি না, ঘাড় ও মেরুদণ্ডের গ্রন্থিসমূহ একটির উপর আরেকটি পূর্ণভাবে স্থাপিত হয়েছে কি না, দুই পায়ের উপর সমান ভার রয়েছে কি না, চোখ খোলা এবং দৃষ্টি সম্মুখে প্রসারিত আছে কি না, হাত শক্তভাবে সোজা আছে কি না। এগুলো লক্ষ্য করতে এবং সব ঠিক আছে নিশ্চিত হতে যতটা সময় লাগে ততটা সময় দাঁড়িয়ে থাকার পর মুসল্লি দ্রুতগতিতে সেজদায় যাবে। সেজদায় গিয়ে আবার সে লক্ষ্য করবে তার মেরুদণ্ড সোজা হয়েছে কি না, দুই হাত দুই কাঁধের নিচে সঠিকভাবে রাখা হয়েছে কি না, হাতদুটি সমান্তরাল রয়েছে কি না, হাঁটু এবং কনুইয়ের মাঝে পেটের নিচ দিয়ে একটি ছাগশিশু এদিক থেকে ওদিকে যাওয়ার মতো ফাঁক রয়েছে কি না, হাটুদ্বয় সমান্তরালভাবে পতিত হয়েছে কি না, নাক এবং কপাল সমভাবে সাজদার স্থানে রাখা হয়েছে কি না, সমস্ত দেহের ভার দুই হাঁটু, দুই পা, দুই হাত, নাক ও কপাল এর উপর সমভাবে পতিত হয়েছে কি না, চোখ খোলা রয়েছে কি না, দুই পা খাড়াভাবে এবং সমান্তরালভাবে রাখা হয়েছে কি না, হাত ও পায়ের আঙ্গুলগুলো কেবলামুখী রয়েছে কি না এবং দুই কনুই দেহ থেকে সামান্য ফাঁক রয়েছে কি না। সবগুলো বিষয় লক্ষ্য করার পর সব ঠিক আছে নিশ্চিত হয়ে সে দ্রুতগতিতে সেজদাহ থেকে উঠে বসবে। বসার পর সে লক্ষ্য করে দেখবে তার বসা সঠিক হয়েছে কি না, মেরুদণ্ড রডের মতো সোজা হয়েছে কি না, ঘাড় মাথা মেরুদণ্ডের সাথে একই লাইনে সোজা হয়েছে কি না, হাত শক্তভাবে সম্পূর্ণ প্রসারিত হয়েছে কি না, বসা নিয়ম মোতাবেক বাঁ পায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কি না, ডান পায়ের পাতা সঠিকভাবে খাঁড়া হয়েছে কি না এবং আঙ্গুলগুলো কেবলামুখী হয়েছে কি না, দুই উরু সমান্তরালভাবে পতিত হয়েছে কি না, দুই হাত হাঁটুর উপর ঠিকভাবে নিবদ্ধ হয়েছে কি না, চক্ষু খোলা কি না, দৃষ্টি সম্মুখে প্রসারিত এবং এক স্থানে নিবদ্ধ কি না অর্থাৎ এক কথায় বসা অবস্থায় যে সমস্ত নিয়ম কানুন আছে তার প্রত্যেকটি যথাযথভাবে পালন করা হয়েছে কি না। এ বিষয়গুলো খেয়াল করতে এবং সবকিছু সঠিক হয়েছে কি না নিশ্চিত হতে যে সময় লাগবে সে সময়টুকু মুসল্লি বসা অবস্থায় থাকবে। তারপর সে দ্রুতগতিতে দ্বিতীয় সেজদায় যাবে। প্রথম সেদজার নিয়মে দ্বিতীয় সেজদা শেষ করে সে আবার দ্রুতগুতিতে উঠে দাঁড়াবে। বর্তমানে বিকৃত ইসলামে যে সালাহ পড়া হয় লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে তা ইসলামের প্রকৃত সালাহর ঠিক বিপরীত। বর্তমানের মুসল্লিরা অতি ধীর গতিতে রুকু এবং সেজদায় যান, রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পর সেজদায় যাওয়ার আগে এবং প্রথম সেজদা থেকে উঠে বসার পর দ্বিতীয় সেজদায় যাওয়ার আগে তারা কোনো সময় দেন না। অর্থাৎ বিশ্বনবীর শেখানো ও তাঁর নিজের কায়েম করা সালাতের ঠিক বিপরীত।

ইসলামের প্রকৃত সালাহর নিয়ম হচ্ছে, এমামের তকবিরের জন্য সতর্ক, তৎপর হয়ে থাকা ও তকবিরের সঙ্গে সঙ্গে জামাতের সকলের সঙ্গে একত্রিতভাবে, একসাথে রুকুতে যাওয়া, এ'তেদাল করা, সাজদায় যাওয়া, সালাম ফেরানো ইত্যাদি করা; ঠিক যেমনভাবে প্যারেড, কুচকাওয়াজের সময় সামরিক বাহিনীর সৈনিকেরা সার্জেন্ট মেজরের (Sergeant-major) আদেশের সঙ্গে সঙ্গে সকলে একত্রিতভাবে মার্চ করে, ডাইনে বামে ঘুরে, দাঁড়ায়, বসে, দৌড়ায়। সঠিক, পূর্ণভাবে সালাহ কায়েম করতে গেলে ১০০ টিরও বেশি ছোট বড় নিয়ম পদ্ধতি পালন করতে হয়। সবগুলো না করলেও অন্তত চৌদ্দটি ফরদ, চৌদ্দটি ওয়াজেব, সাতাশটি সুন্নত আর বারটি মোস্তাহাব খেয়াল রেখে, সেগুলো সঠিক ও পূর্ণভাবে পালন করে সালাহ কায়েম করতে গেলে বর্তমানে সালাতে যে ধ্যানের কথা বলা হয় তা কতখানি সম্ভব? এদিকে আল্লাহর রসুল (সা.) বলেছেন যে– তোমরা পূর্ণভাবে সালাহ কায়েম কর, কারণ আল্লাহ পূর্ণ ব্যতীত সালাহ কবুল করেন না– [আবু হোরায়রা (রা.)]।

সাধারণ জ্ঞানেই (Common sense) বোঝা যায় যে, সালাতের এতগুলো নিয়ম কানুন পালন করে যে ধ্যান বর্তমানের ইসলাম দাবি করে তা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমার এ কথায় যিনি একমত হবেন না তিনি মেহেরবানী করে ঐ নিবিষ্টতা অর্থাৎ ধ্যান নিয়ে চার রাকাত সালাহ পড়তে চেষ্টা করে দেখতে পারেন- দেখবেন সালাতে ভুল হয়ে যাবে।

তবে মনে রাখতে হবে, সালাহ শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক উভয় দিকের সংমিশ্রণ। সালাতে এই বাহ্যিক নিয়মকানুনগুলো যেমন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করতে হবে, তেমনি একই সাথে তার মনের অবস্থা হবে বিনয়াবনত। সে মনে করবে যে সে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়েছে এবং আল্লাহর জন্য তার হৃদয় বিগলিত থাকবে।

ওযু করে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হবার পর সালাতের প্রথম কাজ হলো কাবার দিকে মুখ করে দাঁড়ানো। কেন? আল্লাহকে স্মরণ (যেক্‌র) করতে কাবার দিকে মুখ করে দাঁড়াতে হবে কেন? কাবা আল্লাহর ঘর বলে? আল্লাহতো সর্বত্র আছেন, আমাদের প্রত্যেকের ঘাড়ের রগের চেয়েও যিনি নিকটে আছেন (সুরা কাফ ১৬) তাঁকে স্মরণ করার জন্য হাজার হাজার মাইল দূরে তাঁর ঘরের দিকে মুখ করার প্রয়োজন কী? উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐক্য; মতের ঐক্য, উদ্দেশ্যের ঐক্য, লক্ষ্যের ঐক্য, আকিদার ঐক্য। একদল লোক যদি একত্র হয়ে কোনো নির্দিষ্ট গন্তব্য স্থানের দিকে রওনা হয়, তবে যতক্ষণ তাদের ঐ গন্তব্যস্থানের কথা মনে থাকবে ততক্ষণ তারা একত্রিত থাকবে, একত্রিতভাবেই পথ চলতে থাকবে, কোনো বাধা আসলে একত্রিত হয়েই তা প্রতিহত করবে, একত্রিত হয়েই বাধা অপসারণ করবে। কিন্তু মধ্য পথে যদি তারা হঠাৎ সবাই গন্তব্যস্থানের কথা ভুলে যায় তবে অবশ্যম্ভাবীরূপে তারা আর ঐক্যবদ্ধ, একত্রিত থাকবে না, এক এক জন এক এক দিকে ছড়িয়ে যাবে, দল আর দল থাকবে না।

আল্লাহ-রসুলের দেয়া উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, আকিদা ভুলে যাবার ফলে সালাহ-কে অন্যান্য ধর্মের মতো উপাসনায় পরিণত করার ফলে এই উম্মাহ আজ আর ঐক্যবদ্ধ নেই,

হাজার ভাগে বিভক্ত। আজ এই উম্মাহ শুধু শারীরিকভাবে একই দিকে, কাবার দিকে মুখ করে দাঁড়ায়; মানসিকভাবে বিভিন্ন মযহাবে, ফেরকায়; আত্মিকভাবে বিভিন্ন তরিকায়; রাজনৈতিকভাবে বিভিন্ন ভৌগোলিক রাষ্ট্রে ও রাজনৈতিক দলে বিভক্ত। সালাতের ঐ লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, আকিদার ঐক্য হারিয়ে যাবার ফলে এই জাতি আজ শক্তিহীন, কাজেই অন্য জাতি দ্বারা পরাজিত লাঞ্ছিত, অপমানিত। আল্লাহ বলেছেন– তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না (সুরা আল-এমরান ১০৩)।

কাবার দিকে মুখ করার পর দ্বিতীয় কাজ হলো লাইন করে দাঁড়ানো। শুধু কাবার দিকে মুখ করা নয়, লাইন করে দাঁড়ানো। কেন? আল্লাহকে স্মরণ করতে, তাঁর যেক্‌র করতে, ধ্যান করতে, লাইন করতে হবে কেন? তাঁর যেক্‌র করার সাথে লাইন করার কী সম্পর্ক? একই দিকে মুখ করে ধনুকের ছিলার মতো সোজা লাইন করে দাঁড়ানোর উদ্দেশ্য ঐক্য ও শৃঙ্খলার প্রশিক্ষণ।

সালাতে তারপরের কাজ এমামের (নেতার) তকবিরের (আদেশের) সঙ্গে সঙ্গে আমল (কাজ) করা; সকলে একত্রে, একই সাথে রুকুতে যাওয়া, এমামের আদেশের সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে দাঁড়ানো, সাজদায় যাওয়া, সালাম করা ইত্যাদি। এ হলো আনুগত্য ও আদেশ পালন করার প্রশিক্ষণ এবং এই আনুগত্য ও আদেশ পালন সকলে একত্রে, ঐক্যবদ্ধভাবে। কেউ যদি এমামের আনুগত্য করেও রুকু, সাজদা ইত্যাদি করে কিন্তু সকলের সঙ্গে একসঙ্গে না করে আগে বা নিজের ইচ্ছামতো বেশি পরে করে তবে তার সালাহ হবে না। এমাম যদি রুকু বা সাজদায় যেয়ে একঘণ্টা থাকেন তবে প্রত্যেক মোকতাদীকে তাই থাকতে হবে, নইলে তার সালাহ হবে না। এটি কী শেখায়? এটি কি ধ্যান করা শেখায়? অবশ্যই নয়; এটি শেখায় শর্তহীন আনুগত্য, আদেশ পালন। রুকু, সেজদা করায় এমাম যদি আদেশের ধারাবাহিকতায় একটু ভুল করে তাহলে মুসল্লিরা আল্লাহু আকবার বলে লোক্‌মা দিয়ে এমামকে বুঝিয়ে দেন, এমাম সাথে সাথে সাজদায়ে সহু করে আবার আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি দেন।

আল্লাহ সালাহ-কে ফরদে আইন করে দিয়েছেন। যদিও সালাতের মূল ও মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে সামরিক, যুদ্ধের প্রশিক্ষণ কিন্তু এতেই সালাহ সীমিত নয়। পেছনে বলে এসেছি সালাতের মধ্যে শারীরিক, চারিত্রিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা আল্লাহ রেখে দিয়েছেন। সালাতের সারিতে দাঁড়ানো বিশালদেহী শক্তিশালী লোকটি তার পাশে দাঁড়ানো ছোট, দুর্বল লোকটির প্রতি কোনো অবজ্ঞার ভাব রাখতে পারবে না, কারণ দু'জনেই দাঁড়িয়েছে তাঁর সামনে যিনি দু'জনেরই স্রষ্টা, দু'জনেরই প্রভু। তাকে ভাবতে হবে, কে জানে হয়ত এই ছোট দুর্বল লোকটিই আল্লাহর কাছে আমার চেয়ে প্রিয়। অনুরূপভাবে মহাপণ্ডিত, আলেমের পাশে দাঁড়ানো নিরক্ষর লোকটি, কোটিপতির পাশে দাঁড়ানো দরিদ্র লোকটি, অতি সুন্দর লোকটির পাশে দাঁড়ানো বিশ্রী লোকটি, সবাই তাদের প্রভুর সামনে শ্রেণিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো, সবাই তাঁর কাছে সমান, সবাই তাঁরই উপাসক। কেউ জানে না এদের মধ্যে কার সালাহ আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয়, গ্রহণযোগ্য।

সালাহ এই মনোভাব মুসল্লিদের মধ্যে তৈরি করে। যদি মুসল্লিদের মধ্যে এই মনোভাব প্রতিষ্ঠিত, কায়েম না হয় তাদের সালাহ ক্ষতিগ্রস্ত, তারা সালাতের পূর্ণ প্রশিক্ষণ থেকে বঞ্চিত।

একটি বিশিষ্ট চরিত্রের বহু মানুষ তৈরি করার জন্য সালাহ একটি ছাঁচ (Mould)। এই ছাঁচে ফেলে যে চরিত্র সৃষ্টি হবে তা হবে দৃঢ়, সুশৃঙ্খল, নেতার আদেশে মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধাহীন, সংকল্পের কঠিনতায় তারা ইস্পাতের চেয়েও শান্ দেওয়া মরণজয়ী যোদ্ধা আর সেই সঙ্গে কোমলতায়, ব্যবহারে মাধুর্যে ভরপুর। এই কথাটাই আল্লাহ বলছেন সুরা ফাতাহ্র শেষ আয়াতে। বলছেন- মোহাম্মদ আল্লাহর রসুল; যারা তাঁর সাথে আছে তারা কাফেরদের (শত্রুর) প্রতি কঠোর, কঠিন আর নিজেদের মধ্যে তারা দয়ামায়া, সহমর্মিতায় পূর্ণ। তাদের দেখবে তারা রুকু করছে, সাজদা করছে (সালাহ কায়েম করছে)। অর্থাৎ আল্লাহ বলছেন সঠিক ও পূর্ণভাবে যারা সালাহ কায়েম করবে তারা হবে শত্রুর (কাফের, মোশরেক) জন্য দুর্ধর্ষ, ভয়ংকর যোদ্ধা আর নিজেদের মধ্যে মায়াময়, সহমর্মী, ভাই বন্ধু। বর্তমানে যে পৃথিবীময় সালাহ পড়া হয় এই সালাহ কি এ চরিত্রের মানুষ তৈরি করছে? অবশ্যই নয়; বরং ঠিক উল্টোটাই করছে। বর্তমানের সালাহ যে চরিত্রের জাতি সৃষ্টি করছে তা শত্রু দেখে ভীত, শত্রুর কাছে পরাজিত, লাঞ্ছিত, শত্রুর অবজ্ঞার পাত্র, আর নিজেদের মধ্যে হিংসা, ঈর্ষা, অনৈক্য আর বিভেদ ও সংঘর্ষে লিপ্ত। শুধু তাই নয় তারা নিজের জাতির চেয়ে শত্রুর প্রতি বেশি অনুগত, বেশি হীনম্মন্যতায় পূর্ণ।

শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, চারিত্রিক উন্নতির ব্যবস্থা থাকলেও সালাতের মুখ্য ও মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সুশৃঙ্খল, নেতার আদেশ পালনে আগুনে ঝাঁপ দিতে তৈরি দুর্ধর্ষ, অপরাজেয় যোদ্ধার চরিত্র সৃষ্টি। আমার এই বক্তব্যের প্রমাণ আল্লাহর রসুলের (সা.) কয়েকটি হাদিস। তিনি বলেছেন- ইসলাম একটি ঘর। এই ঘরের থাম, খুঁটি, স্তম্ভ হচ্ছে সালাহ; আর ছাদ হচ্ছে জেহাদ [হাদিস- মুয়ায (রা.) থেকে আহমদ, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ, মেশকাত] মনে রাখতে হবে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের (সা.) কথা আমাদের কথার মতো নয়। তাঁদের প্রতিটি কথা, প্রতিটি শব্দ ভেবে, ওজন করে বলা। আল্লাহর রসুল (সা.) ইসলামকে বেশ কয়েকটি হাদীসেই ঘরের সঙ্গে তুলনা করেছেন প্রকৃত ইসলাম কী তা উদাহরণ দিয়ে আমাদের বোঝাবার জন্য। ঘর মানুষ তৈরি করে কেন? অবশ্যই সেখানে থাকার জন্য, রোদ, বৃষ্টি থেকে বেঁচে ঘরের ভেতরে বসবাস করার জন্য, তাই নয় কি? রোদ-বৃষ্টি থেকে আমাদের বাঁচায় কিসে? ঘরের ভিত্তি? নাকি ঘরের থাম, খুঁটি? নাকি ছাদ? অবশ্যই ঘরের ছাদ। অর্থাৎ ঘর তৈরির আসল উদ্দেশ্যই হচ্ছে ছাদ তৈরি। কিন্তু থাম, খুঁটি, স্তম্ভ ছাড়া ছাদকে ওপরে ধরে রাখা যাবে না আর ঘরের ভিত্তি যদি শক্ত তওহীদের ওপর না হয় তবে তা ধসে পড়বে। কাজেই ঐ থাম, খাম বা খুঁটির প্রয়োজন। ঘরের খাম, খুঁটি তৈরি করেও যদি ওপরে ছাদ তৈরি না করা হয় তবে সেই ঘরে বসবাস করা যাবে না। হীরা-মতি বসানো, সোনা-রূপার তৈরি খাম-খুঁটি অর্থহীন হয়ে যাবে, আজ যেমন হচ্ছে পৃথিবীময়। আজ থাম-খুঁটি তৈরিকেই যথেষ্ট মনে করে সালাহ-ই পড়া হচ্ছে আপ্রাণ চেষ্টা করে; ওপরে ছাদ তৈরি করার

কথা তেরশ' বছর আগেই ভুলে যাওয়া হয়েছে। আজকের এই বিকৃত ইসলামের ঘরের বহু থাম, খুঁটি স্তম্ভ আছে, ছাদ নেই; ছাদ নেই বলেই খ্রিষ্টান, ইহুদি, হিন্দু, বৌদ্ধের হাতে পরাজয়, লান্ছনা, অপমানরূপে ঝড়, বৃষ্টি, প্রখর রোদ ঐ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে একে বসবাসের একেবারে অযোগ্য করে ফেলেছে। কিন্তু একশ' পঞ্চাশ কোটির এই জাতির সে বোধ নেই। তারা নিরবচ্ছিন্নভাবে কোটি কোটি বাকা-টেরা থাম-খুঁটি আর লক্ষ লক্ষ মসজিদ তৈরি করে চলেছে।

আল্লাহর রসুলের (সা.) ঐ হাদিসগুলো থেকে একথা পরিষ্কার যে সালাতের (থাম, খুঁটি, স্তম্ভের) উদ্দেশ্য হলো ছাদকে ওপরে ধরে রাখা, জেহাদকে কার্যকরী করা। অর্থাৎ জেহাদ, যুদ্ধ করে জয়ী হওয়ার জন্য যে চরিত্র প্রয়োজন সেই চরিত্র সৃষ্টি করা; জেহাদের প্রশিক্ষণ। কাজেই জেহাদ, প্রচেষ্টা, সংগ্রাম যদি বাদ দেয়া হয় তবে সালাহ অর্থহীন, অপ্রয়োজনীয়; যেমন যে কোন সামরিক বাহিনী যদি যুদ্ধ করা ছেড়ে দেয় তবে তাদের প্যারেড, কুচকাওয়াজ করা যেমন অর্থহীন, যেমন ছাদ তৈরি করা না হলে থাম, খুঁটি অর্থহীন।

ইসলামকে একটি ঘরের সঙ্গে তুলনা করলে বলতে হয় ইসলাম নামক ঘরের ভিত্তি (ঋড়ঁহফধঃরড়হ) হলো আল্লাহর সার্বভৌমত্ব অর্থাৎ তওহীদ; খাম-খুঁটি (Pillar) হলো সালাহ, আর ছাদ (Roof) হলো জেহাদ। থাম-খুঁটির (Pillar) চেয়ে ছাদ (Roof) যে বেশি প্রয়োজনীয় তা আল্লাহর নবী বলে গেছেন পরিষ্কার করে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো -দীনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কী? তিনি জবাব দিলেন- আল্লাহ ও তাঁর রসুলের ওপর ঈমান; অর্থাৎ তওহীদ, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব। আবার জিজ্ঞাসা করা হলো- তারপর কী? তিনি উত্তর দিলেন- আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ [হাদিস- আবু হোরায়রা (রা.) থেকে মুসলিম, বোখারী]। ইসলামের ঘরের ভিত্তি যে আল্লাহর তওহীদ তা তিনি আগের হাদিসগুলোতে বলেন নি কারণ তওহীদই যে দীনের ভিত্তি তা এত প্রকট যে তা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। কোর'আনে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ একথা বহুবার বলেছেন। তবু দীনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কী অর্থাৎ ভিত্তি কী প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন- তওহীদ। তাহলে দাঁড়ালো এই যে দীনুল ইসলামের ঘরের ভিত্তি আল্লাহর তওহীদ, এর থাম-খুঁটি সালাহ আর এর ছাদ হলো আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ (ঐ তওহীদ এবং তওহীদ-ভিত্তিক দীন সমস্ত পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করার জন্য)।

আল্লাহ ইসলামের যে ঘরটি চৌদ্দশ' বছর আগে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তার ভিত্তি আল্লাহর তওহীদ আজ নেই। আল্লাহর তওহীদ হলো তাঁর সার্বভৌমত্ব; অর্থাৎ ব্যক্তি, পরিবার, গোত্র, গোষ্ঠী, জাতি, রাষ্ট্র, আইন-কানুন, দণ্ডবিধি, অর্থনীতি, সমাজ ব্যবস্থা, শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য শিল্প ইত্যাদি সর্ববিষয়ে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ ছাড়া আর কাউকে গ্রহণ না করা; এক কথায় যে কোনো বিষয়ে, যেখানে আল্লাহর ও তাঁর রসুলের (কারণ রসুল আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া কোনো কথা বলেন নাই- সুরা নজম ৩-৪) কোনো বক্তব্য আছে, নির্দেশ আছে সেখানে পৃথিবীর আর কাউকে স্বীকার না করা। এই তওহীদ আজ পৃথিবীর কোথাও নেই। মুসলিম দুনিয়া বলে, মুসলিম রাষ্ট্র বলে পরিচিত কোনো রাষ্ট্রেও নেই; অথচ এর নিচে

কোনো তওহীদও নেই, যে তওহীদ মহান আল্লাহ গ্রহণ করবেন। এর নিচে যা আছে, অর্থাৎ আজ মুসলিম দুনিয়ায় যা চলছে তা শেরক ও কুফর। তারপর সেই ঘরের ছাদ জেহাদও নেই। তাহলে রইল কী? রইল ঘরটার শুধু খাম-খুঁটি এবং সমস্ত জাতি বিকৃত আকিদায় ঐ খাম-খুঁটিকে অর্থাৎ সালাহ-কে আঁকড়িয়ে ধরে আছে। যেহেতু তওহীদের দৃঢ় ভিত্তি নেই সেহেতু ঐ খাম-খুটিগুলোও আর খাম-খুটি, স্তম্ভ নেই; ওগুলো ভঙ্গুর, ঠুনকো ও মৃদু আঘাতেই ওগুলো ধসে পড়ে যায়, ওগুলো আর যোদ্ধার চরিত্র সৃষ্টি করতে পারে না।

এই দীনের নেতারা, ওলামা, আল্লামা, ফুকাহা, মোহাদ্দেসিন, মুফাস্‌সেরিন এরা সবাই একমত যে আকিদা সহীহ অর্থাৎ সঠিক না হলে ঈমানেরও কোনো দাম নেই এবং স্বভাবত ঈমান-ভিত্তিক সব আমল অর্থাৎ সালাহ (নামাজ), যাকাহ, হজ্ব, সওম (রোযা) এবং অন্যান্য কোনো এবাদতেরই আর দাম নেই, সব অর্থহীন। তাদের এই অভিমতের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু বর্তমানের এই বিকৃত ইসলামে আকিদার অর্থ করা হয় ঈমান। এটি ভুল। আকিদার প্রকৃত অর্থ হলো কোনো বিষয় সম্বন্ধে সঠিক ধারণা। কোনো জিনিস দিয়ে কী হয়, ওটার উদ্দেশ্য কী, ওটাকে কেন তৈরি করা হয়েছে তা সঠিকভাবে বোঝা (এ সম্বন্ধে আমার লেখা ইসলামের প্রকৃত আকিদা বইটি দেখুন)। সালাহ সম্বন্ধে সঠিক আকিদা কী? সঠিক আকিদা পেছনে বলে এসেছি, এখানে আবার পেশ করতে চাই। অত্যন্ত সংক্ষেপে সঠিক আকিদা হলো:

আল্লাহ তাঁর শেষ রসুলকে পাঠালেন এই দায়িত্ব দিয়ে যে তিনি যেন আল্লাহর দেয়া হেদায়াহ ও সত্যদীন পৃথিবীর অন্য সব দীনের ওপর প্রতিষ্ঠা করেন, এবং নিজে এই কথার সাক্ষী রইলেন (সুরা ফাতাহ ২৮)। এই হেদায়াতই হলো তওহীদ, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, সেরাতুল মোস্তাকীম; এবং সত্যদীন হলো ঐ তওহীদের ওপর ভিত্তি করা জীবন-ব্যবস্থা, শরিয়াহ, দীনুল ইসলাম, দীনুল কাইয়্যেমাহ। এই কাজের অর্থাৎ এই সত্যদীনকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করার তরিকা, প্রক্রিয়া অর্থাৎ কোন্ নীতিতে এই কাজ করা হবে তাও আল্লাহ নির্ধারিত করে দিলেন এবং সেটা হলো কেতাল, সশস্ত্র সংগ্রাম, যুদ্ধ। প্রশিক্ষণ ছাড়া, চরিত্র গঠন ছাড়া যুদ্ধ করে জয়লাভ সম্ভব নয়, খাম-খুঁটি, পিলার ছাড়া ছাদ রাখা সম্ভব নয়, কাজেই সেই চরিত্র গঠন ও প্রশিক্ষণের জন্য নির্ধারিত করে দিলেন সালাহ এবং এই সালাহ-কেও ফরদে আইন অবশ্য কর্তব্য (Must) করে দিলেন (সুরা বনি এসরাঈল ৭৮)।

আজ মুসলিম দুনিয়ায় সালাতের সম্বন্ধে আকিদা কী? সালাহ চরিত্র গঠনের মুখ্যত দুর্ধর্ষ, অপরাজেয় যোদ্ধার চরিত্র গঠনের প্রশিক্ষণের প্রক্রিয়া; এই আকিদা বদলে একে অন্যান্য ধর্মের মতো এবাদতের, উপাসনার শুধু আত্মিক উন্নতির প্রক্রিয়া বলে মনে করার ফলে আজ সেই যোদ্ধার চরিত্র গঠন তো হয়ই না এমন কি সালাতের বাহ্যিক চেহারা পর্যন্ত বদলে গেছে। আল্লাহর রসুলের (সা.) বহুবারের দেওয়া তাগিদ- সাবধান বাণী- তোমাদের সালাতের লাইন ধনুকের ছিলার মতো সোজা কর, নাহলে আল্লাহ তোমাদের মুখ পেছন দিকে ঘুরিয়ে দেবেন, তাঁর আদেশ- তোমাদের মেরুদণ্ড, ঘাড় সোজা করে সালাতে দাঁড়াও এ সমস্ত কিছুই

আজ ভুলে যাওয়া হয়েছে। এসব হুকুম না মুসল্লিদের মনে আছে, না এমামদের মনে আছে। কাজেই ঐ সামরিক বাহিনীর প্রশিক্ষণের সালাহ আজ নুজ, বাকা লাইনের; বাঁকা পিঠের মুসল্লি ও এমামদের মরা সালাহ। আল্লাহ কোর'আনে সুরা নেসার ১৪১-১৪২ নং আয়াতে মোনাফেকদের সালাতের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন- মোনাফেকরা শৈথিল্যের সাথে সালাতে দাঁড়ায়। আল্লাহ শব্দ ব্যবহার করেছেন 'কুসালা' যার অর্থ সাহস হারিয়ে ফেলা, অলসতা, ঢিলা-ঢালাভাবে। বর্তমান বিশ্বের মুসলিম নামের এ জাতির সালাতের দিকে তাকালে কুসালা শব্দের অর্থ বুঝতে কারও কষ্ট হবে না। খুশু, খুজুর নামে এ জাতি 'কুসালা' শব্দের যথাযথ প্রয়োগ করছে। সমস্ত বিশ্বে বর্তমানে এই সাহসহীন সালাহ-ই চলছে। এই মরা প্রাণহীন সালাতের পক্ষে বলা হয়- খুশু-খুজুর সাথে নামাজ পড়া উচিত। এই খুশু-খুজু কী? বর্তমানে বলা হয় সমস্ত কিছু থেকে মন সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে আল্লাহর প্রতি মন নিবিষ্ট করা হচ্ছে খুশু-খুজু; অর্থাৎ এক কথায় ধ্যান করা।

প্রশ্ন হচ্ছে, সালাতে আল্লাহকে ধ্যান করাই যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে আল্লাহ সালাতের প্রক্রিয়া, নিয়ম-কানুন এমন করে দিলেন কেন যাতে ধ্যান করা অসম্ভব। খুশু-খুজু অর্থাৎ ধ্যান করাই আল্লাহর উদ্দেশ্য হলে সালাতের নিয়ম হতো পাহাড়-পর্বতের গুহায়, কিম্বা খানকা বা হুজরায় অথবা অন্ততপক্ষে কোনো নির্জন স্থানে ধীর-স্থিরভাবে একাকী বসে চোখ বন্ধ করে মন নিবিষ্ট করে আল্লাহর ধ্যান করা। সালাহ কি তাই? অবশ্যই নয়, সালাহ এর ঠিক উল্টো। বহু জনসমাবেশের মধ্যে যেয়ে সেখানে ধনুকের ছিলার মতো সোজা লাইন করে দাঁড়িয়ে সৈনিকের, যোদ্ধার মতো ঘাড়, মেরুদণ্ড লোহার রডের মতো সোজা করে, এমামের তকবিরের (আদেশের) অপেক্ষায় সতর্ক, তটস্থ, থাকা তারপর তকবিরের সঙ্গে সঙ্গে সকলে একত্রে রুকু, সাজদায় যাওয়া, ওঠা, সালাম দেয়া অর্থাৎ এমামের (নেতার) আদেশ পালন করা। সালাতের প্রায় ১১৪ টি নিয়ম-পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য রেখে, সেগুলো যথাযথভাবে পালন করে ঐ খুশু-খুজুর সাথে অর্থাৎ ধ্যানের সাথে সালাহ সম্পাদন করা যে অসম্ভব তা সাধারণ জ্ঞানেই (Common sense) বোঝা যায়। অথচ ঐ নিয়ম-পদ্ধতি সঠিকভাবে, যথাযথভাবে পালন না করে যেমন-তেমনভাবে সালাহ পড়লে তা আল্লাহ গ্রহণ করবেন না। আল্লাহর রসুল (সা.) বলেছেন- তোমরা পূর্ণভাবে সালাহ কায়েম করো, কেননা আল্লাহ পূর্ণ ব্যতীত সালাহ কবুল করেন না [আবু হোরায়রা (রা.) থেকে]। তিনি আরও বলেছেন- তোমাদের কাহারও সালাহ পূর্ণ (সঠিক) হবে না, যে পর্যন্ত না তোমরা আল্লাহ যেভাবে আদেশ করেছেন ঠিক সেইভাবে কায়েম করবে (আবু দাউদ)। আল্লাহ-রসুলের আদেশ মোতাবেক সমস্ত নিয়ম-কানুন যথাযথ পালন করে অর্থাৎ পূর্ণ সঠিকভাবে সালাহ কায়েম করলে ঐ খুশু-খুজু, অর্থাৎ বর্তমানে মুসল্লিরা খুশু-খুজু বলতে যা বুঝেন তা অসম্ভব। খুশু-খুজুর প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে- মো'মেন যখন সালাতে দাঁড়াবে তখন তার মন পৃথিবীর সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাগ্র হবে সালাতে; সে সমস্তক্ষণ সচেতন থাকবে যে সে মহামহীম আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে আছে, আল্লাহর বিরাটত্ব ও তার নিজের ক্ষুদ্রতা সম্বন্ধে সে থাকবে সর্বদা সচেতন, আর সেই সঙ্গে একাগ্র

হয়ে থাকবে এমামের (নেতার) তকবিরের (আদেশের) প্রতি, সালাহ সঠিকভাবে, নিখুঁতভাবে সম্পাদন করতে। এই হলো খুশু-খুজু।

কিন্তু এই খুশু-খুজু অর্থাৎ একাগ্রতার মানে এই নয় যে সালাতে দাঁড়াবে নুব্জ, সম্মুখে ঝুকে, মাথা নত করে। কারণ যিনি আমাদের সালাহ শিখিয়েছেন আল্লাহর রসুল (সা.) তিনি আদেশ করেছেন- সালাতে দাঁড়াবে সোজা হয়ে, মেরুদণ্ড, ঘাড় সোজা শক্ত করে (সৈনিকের মত)। আল্লাহ কোর'আনে বলছেন- সালাহ কায়েম কর আনুগত্যের সাথে (সুরা বাকারা ২৩৮), আল্লাহ আবার বলছেন সালাহ কায়েম কর বিনয়ের সাথে (সুরা মু'মিনুন ২)। তাঁর রসুল বলছেন- সোজা, শক্ত, দৃঢ়ভাবে সালাতে দাঁড়াও। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় না কি যে দু'টি আদেশ বিপরীতমুখী? না, মোটেই বিপরীতমুখী নয়; আল্লাহর ও তাঁর রসুলের কথা বিপরীত হতে পারে না। একটি মানসিক আর অন্যটি দৈহিক। সালাতে মন থাকবে বিনয়ী, নম্র, অনুগত আর দেহ থাকবে লোহার রডের মতো দৃঢ়, ঋজু; রুকুতে সাজদায় যেয়েও পিঠ ঘাড় হাত, পা থাকবে সোজা, শক্ত; বিচলন, গতি হবে দ্রুত। এই দুই মিলিয়ে হবে ইসলামের প্রকৃত সালাহ। মো'মেন যখন সালাতে দাঁড়াবে তখন তার মনের অবস্থা হবে এই রকম যে সে সর্বক্ষণ সচেতন থাকবে যে সে এই বিশাল বিরাট সৃষ্টির স্রষ্টার, রাব্বুল আলামিনের সামনে দাঁড়িয়েছে। কেন দাঁড়িয়েছে? দাঁড়িয়েছে এই জন্য যে সে ঐ মহান স্রষ্টার খলিফা, প্রতিনিধি, এবং খলিফা হিসাবে তার সর্বপ্রধান দায়িত্ব হচ্ছে সমস্ত পৃথিবীতে আল্লাহর তওহীদ-ভিত্তিক দীন, জীবন-ব্যবস্থা কার্যকরী করে সমস্ত অন্যায়, অত্যাচার-অবিচার, অশান্তি আর রক্তপাত দূর করে শান্তি (ইসলাম) প্রতিষ্ঠা করা। ঐ বিশাল দায়িত্ব পূর্ণ করতে গেলে যে চরিত্র প্রয়োজন, যে চরিত্রে সংকল্পের দৃঢ়তা, ঐক্য, শৃঙ্খলা, আনুগত্যের ও হেজরতের সমাহার সেই চরিত্র সৃষ্টির জন্য সে সালাতে দাঁড়িয়েছে। মনের ভেতরে তার থাকবে বিনয়, সসম্মান-ভক্তি (যারা বিনয়-নম্র নিজেদের সালাতে, সুরা মো'মেনুন-২) আর শারীরিকভাবে সে দাঁড়াবে আল্লাহর মোজাহেদ (যোদ্ধা), সৈনিকের মতো দৃঢ়, লোহার রডের মতো সোজা হয়ে, তটস্থ হয়ে থাকবে এমামের আদেশের (তকবিরের) অপেক্ষায় এবং আদেশের সঙ্গে সঙ্গে সকলে একত্রে হয়ে একসঙ্গে দ্রুত সে আদেশ পালন করবে (কানেতিন- অনুগত, সুরা বাকারা ২৩৮)। এই হচ্ছে ইসলামের প্রকৃত সালাহ। ইসলামের সালাহ যে অন্যান্য ধর্মের ধ্যান নয় তার প্রমাণ সালাতের পুরো প্রক্রিয়াটাই। তার মধ্যে বিশেষ করে এই নিয়মটি যে সালাতে চোখ বন্ধ করা যাবে না। ধ্যান করতে গেলে তো বটেই, এমন কি কোন বিষয়ে একটু গভীরভাবে চিন্তা করতে গেলেও মানুষের চোখ বন্ধ হয়ে আসে। সেই চোখ বন্ধ করাকে নিষিদ্ধ করার মানে এই নয় কি যে সালাতে ধ্যান করার জায়গা নেই, আছে সজাগতা, অতন্দ্র সতর্কতা?

সালাহ শুধু যে ধ্যান নয়, প্রকৃতপক্ষে ধ্যানের ঠিক বিপরীত তার পক্ষে কয়েকটি কারণ পেশ করছি। ১) সালাহ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কোন বাঁকা-টেরা পদার্থ, জিনিসকে আগুনে পুড়িয়ে, হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে কোন কাজের জিনিস তৈরি করা; আর ধ্যান হচ্ছে নিষ্ক্রিয় হয়ে গভীর চিন্তা করা। ২) সালাহ গতিশীল (Dynamic); ধ্যান স্থিতিশীল, স্থবির (Static)। ৩) তাকবিরের (Command)

আনুগত্য করতে হয়; ধ্যানে ঈড়সসধহফ এর কোন স্থানই নেই। ৪) দলবদ্ধভাবে কায়েম করতে হয়; ধ্যান একা একা করতে হয়। ৫) সালাতে চূড়ান্ত সচেতন ও সতর্ক অবস্থায় থাকতে (Alert) হয়; ধ্যানে ঠিক বিপরীত অর্থাৎ নিথর, অচেতন হয়ে যেতে হয়। ৬) সালাহ ঠিক মতো কায়েম করতে হলে ১০০টির বেশি নিয়ম কানুন মনে রেখে তা পালন করতে হয়; ধ্যানে কোন নিয়ম কানুন নেই। ৭) সালাতে চোখ বন্ধ রাখা যাবে না; চোখ বন্ধ না করে ধ্যান প্রায় অসম্ভব। ৮) সালাহ সক্রিয় (Active); ধ্যান নিষ্ক্রিয় (Inactive)। ৯) অন্ধকারে সালাহ হয় না, পক্ষান্তরে অন্ধকারই ধ্যানের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ, ১০) সালাহ প্রচণ্ড গতিশীল, দুর্বার, বিশ্বজয়ী, মৃত্যুভয়হীন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা তৈরি করে; ধ্যান দুনিয়া বিমুখ, অন্তর্মুখী রিপুজয়ী সুফি দরবেশ তৈরি করে।

যদি কাউকে বলা হয় তুমি জনাকীর্ণ রাজপথে দৌড়াবে আর সেই সঙ্গে ধ্যান করবে তাহলে ব্যাপরটা কী রকম হবে? এটি যেমন হাস্যকর তেমনি হাস্যকর কাউকে বলা যে তুমি সালাহ কায়েম করবে এবং সেই সঙ্গে ধ্যানও করবে। কারণ দৌড়ানোর সময় যেমন চোখ খোলা রেখে, কোথায় পা ফেলছে তা দেখে, রাস্তার গাড়ি ঘোড়া দেখে দৌড়াতে হবে, তখন ধ্যান অসম্ভব, তেমনি সালাতের সময়ও সালাতের ১১৪টি নিয়ম কানুন মনে রেখে, রাকাতের হিসাব রেখে সেগুলো পালন করার সাথে ধ্যান করাও অসম্ভব। সুতরাং সালাহ ও ধ্যান বিপরীতমুখী দু'টি কাজ যা একত্রে অসম্ভব। অথচ সালাহ সম্বন্ধে আকিদার বিকৃতিতে একে অন্যান্য ধর্মের উপাসনার সাথে এক করার চেষ্টায় এই অসম্ভব আকিদাই আজ মুসলিম হবার দাবিবার এই জনসংখ্যার আকিদা। সালাহর উদ্দেশ্য কী, এ ব্যাপারে আকিদার বিকৃতির পর থেকে গত কয়েক শতাব্দী থেকে মুসলিম নামের এই জনসংখ্যাটি দৌড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ধ্যান করার আপ্রাণ চেষ্টা করছে এবং ফলে তাদের না দৌড় হচ্ছে না ধ্যান করা হচ্ছে।

সালাহ ও ধ্যান পরস্পর বিপরীত এ কথার মানে এই নয় যে এর মাধ্যমে সালাহর আধ্যাত্মিক দিক অস্বীকার করা হচ্ছে। যেখানে সারা জীবনের ধ্যান ও তাসাউফ সাধনা একজন সুফীকে জীবন ত্যাগ করতে শেখায় না সেখানে সালাহ এমন এক আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ যা সালাহ কায়েমকারীকে এমন মৃত্যুভয়হীন দুর্ধর্ষ যোদ্ধায় পরিণত করে যে, সে নির্দ্বীধায় আল্লাহর দুনিয়ায় আল্লাহর কলেমা প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন ও সম্পদ বিসর্জন দেওয়ার জন্য পস্তুত হয়ে যায়। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, বর্তমান মুসলিম বলে পরিচিত এ জনগোষ্ঠীর পণ্ডিতগণ সালাহকে সামরিক প্রশিক্ষণ হিসাবে তো মানেই না বরং তারা সালাহকে যে ধ্যান বলে প্রচার করে তারা সেই ধ্যানও করে না অর্থাৎ ওরা ট্রেনিংও করে না আবার ধ্যানও করে না। তাদের কোনটাই হয় না। কারণ ধ্যান করলে তো অসংখ্য রিপুজয়ী সুফী দরবেশ তৈরি হতো, সেক্ষেত্রে অপরাধ, অন্যায়, অবিচার কিছুটা হলেও তো কমত। তাও হয়নি। বরং তাদের নামাজ আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় সুরা নিসার ১৪২-১৪৩ নং আয়াত যেখানে আল্লাহ বলছেন "নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে ধোঁকাবাজি করে; বস্তুতঃ তিনি তাহাদিগকে উহার শাস্তি দেন আর যখন তারা সালাতে দাঁড়ায়, তখন শৈথিল্যের সাথে দাঁড়ায় কেবল লোক দেখানোর জন্য এবং

আল্লাহকে তাহারা অল্পই স্মরণ করে; তারা থাকে দোটানায় দোদুল্যমান, না এ দিকে, না ওদিকে। আল্লাহ যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি তাহার জন্য কখনও কোন পথ পাইবে না।"

সালাতের আত্মিক ভাগ

প্রাসঙ্গিক কারণে সালাহর আত্মিক বিষয়টি সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। সালাতের আত্মা হচ্ছে যেকরাল্লা, আল্লাহর যেকর করা। যেকর মানে কী? যেকর অর্থ কোন কিছুকে স্মরণ করা, মনে করা। যেমন আপনি আপনার সন্তানের কথা মনে করলেন, আপনার বন্ধু বিদেশে আছে, আপনি তার কথা মনে করলেন, মানেই আপনি তাদের যেকর করলেন। এভাবে আপনি আল্লাহকে মনে করলেন মানেই আপনি আল্লাহর যেকর করলেন। অর্থাৎ সালাতের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহকে মনে রাখা অর্থাৎ আল্লাহকে যেকর করা এটাই হলো সালাতের আত্মিক ভাগ।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে- আল্লাহকে মনে করব কী রূপে, কী ভাবে? প্রথমে মনে করতে হবে যাঁর সামনে দাঁড়ানো হয়েছে তিনি অসীম। অসীম কী? মানুষ সীমিত, ক্ষুদ্র, তার পক্ষে অসীমকে ধারণ করা অসম্ভব। আল্লাহ যেমন অসীম তাঁর সিফতগুলোও তেমনই অসীম। তিনি অসীম রহমান, অসীম রহিম, অসীম রব, অসীম খালেক (স্রষ্টা) ইত্যাদি তাঁর যত সিফত আছে তাঁর মতোই তাঁর প্রত্যেকটি সিফত অসীম। সালাতে তাহরীম বাঁধার পর এবং কোর'আনের সুরা আবৃত্তি করার পর রুকুতে যেয়ে অর্থাৎ তাঁর কাছে মাথা নত করে মনে করতে হবে তিনি আযম; অর্থাৎ বিশাল বিরাট, যে বিরাটত্বের, বিশালতার কোন সীমা নেই। এবং এই বিরাট এবং বিশালতা সোবহান অর্থাৎ চূড়ান্ত ত্রুটিহীন, দোষহীন এবং নিখুঁত, যাঁর চেয়ে ত্রুটিহীন এবং নিখুঁত কোন কিছু হয় না। আর মুসল্লি সেই বিশালতার সামনে অতি-অতি ক্ষুদ্র এবং তাঁর সামনে অবনত। তারপর সামি আল্লাহু লেমান হামীদা বলে দাঁড়াতে হয়, অর্থাৎ মুসল্লি যে তাঁর হামদ ঘোষণা করলো আল্লাহ তা শুনলেন। অতঃপর সেজদাহ। সেজদায় গিয়ে বলবে সোবহানা রাব্বি আল আ'লা। আ'লা অর্থ উচ্চতম, অসীম উচ্চ, যে উচ্চতার সীমা নেই এবং এই অসীম উচ্চতা সোবহান অর্থাৎ চূড়ান্ত ত্রুটিহীন, দোষহীন এবং নিখুঁত। মুসল্লি তাঁর সামনে অতি অতি নিচু এবং তাঁর পায়ে সেজদাহ-অবনত। এই অসীম বিশালতা এবং এই অসীম উচ্চতার একত্রিত রূপ আল্লাহু আকবার অর্থাৎ আল্লাহ অতি বড়। এই বড়ত্ব উচ্চতা ও বিশালতা উভয় দিক থেকে। এই বড়ত্বেরও কোন সীমা নেই। আল্লাহর এই রূপকে সর্বক্ষণ মনে রেখে সালাহ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কায়েম করাই হলো সালাতে আল্লাহর যেকর, যেকরাল্লাহ।

মুসল্লি যখন রুকুতে গেল তখন তার অবস্থা মুসলিম। এবং যখন সেজদায় গেল তখন সে মো'মেন। মুসলিম হলো যে আল্লাহর সকল হুকুম, বিধানকে সসম্মানে তাসলিম করে নেয়। যখন মুসল্লি রুকুতে গেল সে আল্লাহর বিরাটত্বের কাছে নিজের ক্ষুদ্রতাকে সমর্পণ করলো, তাই তখন সে মুসলিম। আর যখন সে সেজদায় গেল, তখন সে তার সমস্ত সত্ত্বাকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করলো। এটি মো'মেনের অবস্থা। এ বিষয়টি ভালোভাবে বোঝার জন্য এখানে একটি নকশা দেওয়া হলো।

সালাতের রুকুতে, সেজদায় যাওয়ার সময় এবং অন্য সকল চলন (Movement) এ যখন আল্লাহু আকবর বলা হয় তখন আল্লারর এই বিরাটত্ব, আযমত ও উচ্চতা সবকিছুই এর মধ্যে চলে আসে। এই সম্পূর্ণটা মিলিয়েই আল্লাহু আকবার। আল্লাহর এই রূপকে মনে রাখাই হলো সালাতে আল্লাহর যেকর অর্থাৎ যেকরাল্লাহ।

যারা আল্লাহর রসুলের (সা.) পদতলে বসে ইসলাম শিখেছিলেন এবং তাঁর হাতে বায়াত নেবার পর বহু বছর তাঁর সঙ্গে দিনে পাঁচবার সালাহ কায়েম করেছেন তাদের অন্যতম এবং দ্বিতীয় খলীফা ওমর (রা.) বিন খাত্তাবের আকিদায় সালাহ কী ছিল? একদিন মো'মেন মোজাহেদদের সালাহ পর্যবেক্ষণ করার সময় তিনি দেখলেন একজন ঠিকই দৃঢ় এবং সোজাভাবে দাঁড়িয়েছেন, কিন্তু তার মাথাটি খানিকটা সামনের দিকে ঝোঁকানো। ওমর (রা.) ঐ মোজাহিদের মাথা ধরে উঁচু, সোজা করে দিলেন এবং তারপর তার মাথায় মৃদু আঘাত করে বললেন খুশু এখানে নয়, বলে তার বুকে আংগুল রেখে বললেন- খুশু এখানে।

সামরিক বাহিনীর প্যারেডের সঙ্গে সালাতের মিল শুধু এটুকুই নয়– আরও আছে। আল্লাহ কোর'আনে আদেশ করেছেন যে তোমরা সর্বদা মসজিদে যেতে উত্তম পোশাক-পরিচ্ছদ পরে যাবে (সুরা আরাফ আয়াত ৩১)। শব্দ ব্যবহার করেছেন 'যিনত', যার অর্থ জাক-জমকপূর্ণ, চাকচিক্যময়। যিনত অর্থ অলংকারও (সুরা নুর আয়াত ৩১)। মস্‌জীদে যে সব কারণে যেতে হয় তার মধ্যে মুখ্য কারণ সালাহ কায়েম করা। অর্থাৎ আল্লাহ আদেশ করেছেন সালাতে দাঁড়াতে তোমরা জাক-জমকপূর্ণ কাপড়-চোপড়, পরিচ্ছদ পরে নেবে। প্রশ্ন হচ্ছে এবাদত করার জন্য, আল্লাহর সামনে বিনীত, বিনয়-নম্র হয়ে দাঁড়ানোর জন্য অমন সাজ-সজ্জা করার আদেশ কেন?

যে কারণে একটি সামরিক বাহিনীর প্যারেড, কুচকাওয়াজ করার সময় তাদের পোশাক পরিচ্ছদ অর্থাৎ ইউনিফর্ম একই রকম, ইস্ত্রি করা পরিষ্কার হওয়া বাধ্যতামূলক, ঠিক সেই কারণেই মসজিদে সালাতের সময় জাক-জমকপূর্ণ পোশাক পরার জন্য আল্লাহর এই হুকুম। বর্তমানে সামরিক বাহিনীগুলো জাতির মধ্যে থেকে বেছে বেছে লোক নিয়ে গঠন করা হয়, কাজেই তাদের জন্য একই রকম পোশাক অর্থাৎ ইউনিফর্ম বাধ্যতামূলক করা সম্ভব হয়। কিন্তু উম্মতে মোহাম্মদী সম্পূর্ণ জাতিটাই একটি সামরিক বাহিনী; যে কথা পেছনে বলে এসেছি। এর পুরুষ-নারী, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সব সৈনিক, প্রত্যেকে মোজাহেদ। এদের সবাইকে একই পোশাক পরার আদেশ দেওয়া বাস্তবসম্মত নয়। তাই আল্লাহ তা না দিয়ে যার পক্ষে যতটুকু সম্ভব উত্তম, জাক-জমকপূর্ণ পোশাক পরে সালাতের, মো'মেনদের কুচকাওয়াজ করার আদেশ দিয়েছেন।

সালাতের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আকিদা আজ বিকৃত হয়ে যাওয়ার ফলে এ জাতির লোকেরা যেমন আঁকাবাঁকা লাইনে মাথা নিচু করে; নুজ হয়ে দাঁড়িয়ে যেন-তেনভাবে সালাতের অনুষ্ঠান করে, তেমনি একই কারণে সাধারণ বাজে কাপড় পরে সালাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহর আদেশ অমান্য করে। এরাই আবার বিয়ে-সাদী এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে তাদের সবচেয়ে ভালো পোশাক পরিচ্ছদ পরে। আল্লাহর

রসুলের সময় উম্মতে মোহাম্মদী যে সালাতের পোশাক সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন তার প্রমাণ আমরা পাই হাদীসে রাসুলে। আল্লাহর রসুল (সা.) বলেছেন– সামর্থ্য থাকলে তোমরা জুমার সালাতের জন্য একজোড়া আলাদা কাপড় রাখবে, কাজের কাপড় ব্যতীত [আবদুল্লাহ বিন সালিম (রা.) থেকে ইবনে মাজাহ, মেশকাত]। তিনি আরও হুকুম করেছেন– তোমরা সালাহ কায়েম করতে অবশ্যই দু'টো কাপড় পরিধান করবে (ইবনে ওমর (রা.) থেকে– এমাম তাহাভী, মেশকাত)। এক ব্যক্তি আল্লাহর রসুলের (সা.) কাছে এসে একটি কাপড় পরে সালাহ কায়েম করা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন– তোমাদের প্রত্যেকের কি দু'টো করে কাপড় রাখার সামর্থ্য আছে? [আবু হোরায়রা (রা.) থেকে– বোখারী]। অর্থাৎ যাদের দু'টো কাপড় রাখার সামর্থ্য আছে তারা যেন দু'টো কাপড় রাখে এবং ঐ বিশেষ কাপড় পরে সালাহ কায়েম করে।

১. একদা হযরত আবু যর গিফারি (রা.) পুরাতন কম্বলে শরীর আবৃত করে পথে বের হলে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো, এই ছেড়া কম্বলটি ছাড়া আপনার কি আর কোন পোশাক ছিল না? তিনি জবাব দিলেন, থাকলে অবশ্যই তুমি তা আমার পরিধানে দেখতে পেতে। লোকটি বললো- তা কী করে হয়, মাত্র দুই/তিন দিন আগেই আমি আপনার পরনে অতি উত্তম এক জোড়া পোশাক দেখেছি। আবু যর (রা.) বললেন, সেটা আমি একজন অভাবী লোককে দিয়ে দিয়েছি। লোকটি মন্তব্য করলো, আল্লাহর শপথ! এই দুনিয়ার বুকে আপনার চাইতে অভাবী কোন লোক থাকতে পারে বলে আমার ধারণা ছিল না। হযরত আবু যর (রা.) জবাব দিলেন, হতভাগা! আমার শরীরে তো একটি কম্বল আছে, সেই লোকটির হয়তো তাও ছিল না। শুন, এই পোশাকটির অতিরিক্ত সালাহ কায়েম করার মতো একটি 'আবা'ও আমার ঘরে রক্ষিত আছে। আমার কয়েকটি ছাগী আছে, যেগুলো দুধ দেয়। বাহনের জন্য একটি গাধা আছে। কাজকর্ম করবার মতো একটি বাঁদী আছে। এরপরেও কি আমি অভাবী? আমার তো ভয় হয়, কেয়ামতের দিন এই সম্পদরাশির হিসাব দিতে গিয়েই আমি না অপারগ হয়ে পড়ি। [বিপ্লবী সাহাবী হযরত আবু যর গিফারী (রা.)- মুহিউদ্দিন খান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ]।

২. মহানবী (সা.) বলেছেন- তোমাদের কাহারও পক্ষে ইহা আপত্তির বিষয় নয় যে, যদি তাহার সামর্থ্য থাকে জুমার দিনের জন্য এক জোড়া পৃথক কাপড় রাখবে কাজের কাপড় ব্যতীত [আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রা.) থেকে ইবনে মাজাহ, মেশকাত]।

৩. এক ব্যক্তি রাসুল (রা.) এর কাছে এসে একটি কাপড় পরে সালাহ কায়েম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, তোমাদের প্রত্যেকের কি দু'টো করে কাপড় রাখার সামর্থ্য আছে? [আবু হোরায়রা (রা.) থেকে- বোখারী]

হাদিস গুলোতে দু'টো কাপড় রাখার অর্থ হচ্ছে– নবী করিমের সময় আরবদের আর্থিক অবস্থা ছিল অতি করুণ। সমস্ত পৃথিবীতে এত দরিদ্র আর কোন জনসমষ্টি ছিল কিনা সন্দেহ। অধিকাংশ লোকেরই পরিধানে থাকতো একটি কাপড়, কম্বল বা চাদর মাত্র যা দিয়ে তারা শরীরের ঊর্ধাংশ ও নিম্নাংশ আংশিকভাবে ঢেকে

রাখতেন। শরীরের ঊর্ধ্বাংশ ও নিম্নাংশের জন্য আলাদা আলাদা কাপড় পরা সম্ভব ছিল শুধু আর্থিক দিক দিয়ে স্বচ্ছলদের পক্ষে। এজন্যই রসুলাল্লাহ আদেশ করেছেন– যাদের জন্য সম্ভব তারা যেন দু'টো কাপড়, অর্থাৎ ঊর্ধাঙ্গের জন্য একটি ও নিম্নাঙ্গের জন্য আরেকটি কাপড় সালাতের সময় পরে নেয়, অর্থাৎ যে যতখানি পারে 'যিনত' সাজ-সজ্জা, জাঁক-জমক প্রকাশ করে। পরে যখন উম্মতে মোহাম্মদী জেহাদ ও কেতালের (সংগ্রাম ও সশস্ত্র যুদ্ধের) মাধ্যমে অর্ধেক পৃথিবীর বুকে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করে তখন আরবের ঐ চরম দারিদ্র্য শেষ হয়ে প্রাচুর্যে ভরে যায় এবং তখন আল্লাহর আদেশ– সালাতে 'যিনত' প্রদর্শন পুরোপুরি অর্থবহ হয়।

প্রকৃত তওহীদ ও জেহাদ অর্থাৎ মো'মেন হবার আল্লাহর দেয়া সংজ্ঞা (সুরা হুজরাত-১৫) থেকে বিচ্যুত, আল্লাহর অভিশপ্ত (লা'নত প্রাপ্ত) এই জাতিকে সালাতের উদ্দেশ্য বোঝাবার চেষ্টায় ইতিহাস (তা'রিখ) ও হাদিস থেকে দ্বিতীয় খলিফা ওমর (রা.) বিন খাত্তাবের উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি চাবুক হাতে মুসল্লিদের লাইনের মধ্য দিয়ে হাটতেন এবং কাউকে ধনুকের ছিলার মতো সোজা লাইন থেকে বা অন্য কোন বিচ্যুতি দেখলে এবং চাবুক দিয়ে আঘাত করতেন। যারা সালাহ, তাদের ভাষায় নামাজের উদ্দেশ্য ধ্যান করা মনে করেন (এবং এই আকিদাই মুসলিম দুনিয়ায় আজ সর্বব্যাপী), তাদের কাছে আমার প্রশ্ন- চাবুক মেরে কি মানুষকে ধ্যান করানো যায়? ওমরের (রা.) কাজ কি সৈন্য বাহিনীর প্যারেডের সার্জেন্ট মেজরের (Serjeant Major) কাজের সাথে মিলে না, যে প্যারেডের প্রশিক্ষণে ভুল ত্রুটি হলে গালি দেয়, পিটায়? আর প্রথম সারির আসহাব, ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা জানতেন না সালাহ ধ্যান করার জন্য নাকি সামরিক প্রশিক্ষণ? আল্লাহর লা'নতের ফলে এ জাতির সাধারণ জ্ঞান (Common sense) পর্যন্ত লোপ পেয়েছে।

আল্লাহ কোর'আনের সর্বত্র আদেশ করেছেন, মো'মেনদের আদেশ করেছেন, সালাহ কায়েম কর, কোথাও বলেন নি সালাহ পড় বা সালাহ আদায় কর। আল্লাহ সালাহ কায়েম করতে কেন বলেছেন এ নিয়ে আলেম, মুফাস্‌সিরদের মধ্যে বহু আলোচনা, ব্যাখ্যা হয়েছে। বেশির ভাগের ব্যাখ্যা হচ্ছে- খুব নিয়মিত এবং সময় মত, সালাহ পড়া, কোন কাযা না করা। এ ব্যাখ্যা ভুল, কারণ কোন কাযা না করে নিয়মিত, এবং সময়মত সালাহ পড়েও সালাহ কায়েম নাও হতে পারে। কায়েম শব্দের অর্থ প্রতিষ্ঠা; চিরদিনের জন্য, স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা। সালাহ কায়েম করার অর্থ সালাহ যা শেখায় যে গুণগুলো তৈরি করে তা মুসল্লির চরিত্রের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা; স্থায়ীভাবে গেঁড়ে দেয়া। সালাহ যদি মুসল্লির চরিত্রে ঐ গুণগুলো তৈরি না করে তবে সারা জীবনে এক ওয়াক্ত সালাহ কাযা না করলেও সে মুসল্লির সালাহ কায়েম করা হবে না। প্রশ্ন হচ্ছে, সালাহ কী কী রকম গুণ (Attributes, Quality) তৈরি করে? এর সম্পূর্ণ তালিকা, আমার পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়; কোন মানুষের পক্ষেও সম্ভব নয়, এ সম্ভব শুধু আল্লাহর পক্ষে এবং সম্ভবত আল্লাহর রসুলের (সা.) পক্ষে। তবে আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি যে দৈহিক, মানসিক, আত্মিক, আধ্যাত্মিক, সমস্ত রকমের গুণের অর্জন ও উন্নতির প্রক্রিয়া এই সালাহ যদি তা সঠিক আকিদার সঙ্গে এবং সঠিকভাবে কায়েম করা হয়। তবে এর প্রথম ও সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য হলো সেই সব গুণ অর্জন করা যে সব গুণ চরিত্রে দৃঢ়ভাবে

প্রতিষ্ঠিত না হলে মো'মেনের ওপর ঈমানের পরই দ্বিতীয় যে দায়িত্ব, যে দায়িত্ব মো'মেন হবার সংজ্ঞার মধ্যেই আল্লাহ দিয়ে দিয়েছেন, [মো'মেন শুধু তারা যারা আল্লাহ ও রসুলের ওপর ঈমান এনেছে তারপর আর কোন সন্দেহ করে না এবং তাদের প্রাণ ও সম্পদ দিয়ে জেহাদ করে (ঐ তওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য) (সুরা হুজরাত ১৫)] অর্থাৎ জেহাদ করা সম্ভব নয়। সে গুণগুলো হলো- ঐক্য, শৃঙ্খলা, এতায়াত (আদেশ পালন) ও হেজরত। এই সামরিক গুণগুলো অর্জনই সালাতের প্রাথমিক উদ্দেশ্য, তার কারণ পৃথিবীতে আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া হিসাবে আল্লাহ জেহাদ ও কেতালকে (সশস্ত্র যুদ্ধ) নীতি হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। ঐ প্রাথমিক গুণগুলো অর্জন ও মুসল্লির চরিত্রের মধ্যে তা প্রতিষ্ঠার পর অন্যান্য গুণাবলিও ক্রমে ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হবে। এই আকিদার সঙ্গে এবং আল্লাহ-রসুল যেভাবে যে নিয়ম নির্ধারিত করে দিয়েছেন ঠিক সেইভাবে আজ পৃথিবীতে সালাহ সম্পাদন হয় না বলেই সালাতের কোন ফল নেই। যে সালাহ মুসল্লিদের চরিত্রে ইস্পাতের মতো কঠিন ঐক্য সৃষ্টি করে না, পিঁপড়ার মতো শৃঙ্খলা, মালায়েকদের মতো আদেশ পালন, আনুগত্য সৃষ্টি করে না, আল্লাহর বিরুদ্ধে যা কিছু আছে সে সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন, হেজরত করায় না, শাহাদাতের জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা জন্মায় না, শত্রুর প্রাণে ত্রাস সৃষ্টিকারী দুর্ধর্ষ মোজাহেদ, যোদ্ধার চরিত্র সৃষ্টি করে না, সে সালাহ অর্থহীন, সে সালাতের আনুষ্ঠানিকতা করা- না করা সমান।

আল্লাহ মো'মেনদের আদেশ করছেন- তোমরা সালাহ ও সবরের সাথে আমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো (সুরা বাকারা ১৫৩)। আদেশটি গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থবহ। এ আদেশের অর্থ বুঝতে গেলে সালাতের সঙ্গে সবরের অর্থও বুঝতে হবে। বর্তমানের বিকৃত ইসলামের ভুল আকিদায় সবরের অর্থ ধৈর্য, সহ্য করা ইত্যাদি। সবর শব্দটি শুনলেই মনে যে আকিদাটা উদয় হয় তা জড়, অসাড়, নিষ্ক্রিয় (Passive)। অর্থাৎ সবর করা মানে নিষ্ক্রিয়, জড় হয়ে সব অন্যায়, অত্যাচার-অবিচার সহ্য করা, কিছু না করা, এমনকি অনেকের কাছে প্রতিবাদ পর্যন্ত না করা। সবর শব্দের প্রকৃত অর্থ, যে অর্থে আল্লাহ তাঁর কোর'আনে এবং রসুল তাঁর হাদিস ব্যবহার করেছেন তা বর্তমানের এই অর্থের ঠিক বিপরীত। প্রচণ্ড গতিশীল (Dynamic) ইসলামকেই যেমন আকিদার বিকৃতিতে স্থবির (Static) করে ফেলা হয়েছে তেমনি সবর শব্দের অর্থকেও নিষ্ক্রিয় অর্থে নেয়া হচ্ছে। সবর শব্দের অর্থ বাংলায় বোঝাতে গেলে বলতে হয় 'সংকল্পের দৃঢ়তা' ইংরাজীতে Determined Perseverance; কোন উদ্দেশ্য অর্জন করতে দৃঢ়ভাবে সমস্ত কিছু সহ্য করা। যত বাধা আসুক, যত বিপদ-আপদ আসুক, যত কষ্ট হোক, বিন্দুমাত্র নিরাশ বা হতাশ না হয়ে পর্বতের মতো অটল থেকে প্রাণান্ত প্রচেষ্টা, সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। জেহাদে, যুদ্ধে এই সবর অবলম্বনেরই আদেশ দিয়েছেন আল্লাহ তাঁর কোর'আনে এবং বলেছেন আমি স্বয়ং সাবেরদের (সবর অবলম্বনকারীদের) সাথে আছি (সুরা বাকারা ১৫৩)।

এখন একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে আল্লাহ সালাতের এবং সবরের সঙ্গে তাঁর কাছে দোয়া করতে বলছেন কেন? তিনি সালাহ ও যাকাতের সঙ্গে, সালাহ ও হজের সঙ্গে, সালাহ ও সওমের (রোযা) সঙ্গে, কোন কিছুর সাথেই না বলে সালাহ

ও সবরের সাথে বলেছেন কেন? সালাহ মো'মেনের চরিত্রের মধ্যে যে অসংখ্য গুণ সৃষ্টি করে তার মধ্যে শুধু প্রাথমিক যে কয়টি, অর্থাৎ ঐক্য, শৃঙ্খলা, আনুগত্য ও হেজরত এই কয়টির সঙ্গে যদি সবরের গুণগুলো অর্থাৎ সংকল্পের দৃঢ়তা, প্রাণ থাকতে নিরাশ, হতাশ, নিরুদ্যম না হয়ে অটল থেকে পূর্ণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া ইত্যাদি যোগ করা হয় তবে কী দাঁড়ায়? দাঁড়ায় এই যে ব্যক্তি হোক, পরিবার হোক, গোত্র হোক, জাতি হোক যাই হোক, সালাতের সৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী হয়ে সবরের সঙ্গে সংগ্রাম প্রচেষ্টা করলে সে বা তারা অজেয়, অপরাজিত হয়ে যায়, সফলতা বিজয় তাদের জন্য অবধারিত হয়ে যায়। তাই আল্লাহ আদেশ করেছেন শুধু সালাতের সঙ্গে নয় সালাতের সঙ্গে সবরেরও। আরও বলেছেন- নিরাশ হয়ো না, নিরুদ্যম হয়ো না বিজয়ী তোমরা হবেই, যদি তোমরা মো'মেন হও (সুরা আল এমরান- ১৩৯)। অর্থাৎ আমরা যদি সত্যই মো'মেন হই তবে বিজয়ী আমরা হবোই এটি আল্লাহর দেয়া প্রতিশ্রুতি।

বর্তমানে মো'মেন বলে পরিচিত ১৫০ কোটির এই জাতিটি পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত জাতির কাছে প্রত্যেক ব্যাপারে পরাজিত, তাদের দ্বারা লাঞ্ছিত, অপমানিত, তাদের দ্বারা নিহত, এদের মেয়েরা তাদের দ্বারা গণধর্ষিতা। সুতরাং এ সিদ্ধান্ত অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই যে আল্লাহর কথা যদি সত্য হয়ে থাকে তবে এই জাতি মো'মেন নয় এবং মো'মেন না হওয়ার অর্থ অবশ্যম্ভাবী মোশরেক, কাফের হওয়া; এবং আল্লাহ অঙ্গীকার করেছেন যে তিনি মোশরেক ও কাফেরদের মাফ করবেন না (সুরা নেসা- ৪৮, ১১৬, সুরা কাহফ- ১০২, ১০৫, ১০৬)। এই দুনিয়াতে তিনি যেমন মাফ করছেন না, অন্যান্য জাতিগুলো দিয়ে নিষ্পেষিত করে কঠিন শাস্তি দিচ্ছেন, ঐ দুনিয়াতে এই জাতিকে এর চেয়ে কঠিন শাস্তি দেবেন। আর যদি বর্তমানের মুসলিম বলে পরিচিত জনসংখ্যাটি তাদের দাবি মোতাবেক মো'মেন হয়ে থাকে তবে আল্লাহ মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছেন (নাউজুবিল্লাহ)।

বিকৃত আকিদায় বর্তমানের বিপরীতমুখী ইসলামে সালাহকে অন্যান্য ধর্মের উপাসনা, পূজা হিসাবে নেয়ার ফলে আজ এটি আল্লাহর-রসুলের শেখানো সালাহ থেকে বিচ্যুত, সুতরাং সালাতের উপকার থেকে বঞ্চিত। সালাহ যে ধ্যান, আল্লাহর প্রতি নিবিষ্টতা তা প্রমাণ করতে একটি হাদিস উপস্থাপন করা হয়। সেটা হলো- একবার এক যুদ্ধে আলীর (রা.) পায়ে একটি তীর বিঁধে যায়। লোকেরা যখন তীরটি টেনে বের করার চেষ্টা করলো তখন তিনি তীব্র ব্যাথায় তাদের তীরটি খুলতে দিলেন না। অথচ তীরটি তাঁর পা থেকে না খুললেই নয়, তাই তারা বিশ্বনবীর কাছে যেয়ে ব্যাপারটা বললেন। আল্লাহর রসুল (সা.) শুনে বললেন- আলী যখন সালাতে দাঁড়ায় তখন তোমরা তীরটি বের করে নিও। এরপর আলী (রা.) যখন সালাতে দাঁড়ালেন তখন তাঁর পা থেকে তীরটি টেনে বের করে নেয়া হলো, তিনি নড়লেন না, টু শব্দটিও করলেন না।

এই ঘটনাকে বর্তমানের বিকৃত আকিদায় নেয়া হয় এইভাবে যে, সালাতে দাঁড়ানো অবস্থায় আলী (রা.) আল্লাহর চিন্তায় এমন বিভোর হয়ে যেতেন যে তার বাহ্যজ্ঞান থাকতো না, দুনিয়ায়, চারপাশে কী হচ্ছে না হচ্ছে তার তিনি কিছুই জানতেন না,

এমন কি যে তীর টেনে বের করার চেষ্টায় তাঁর অসহ্য ব্যাথা লাগতো সে তীর টেনে বের করার ব্যাথাও তিনি অনুভব করলেন না। প্রশ্ন হচ্ছে- সালাতে যদি আলীর (রা.) ঐ অবস্থা হয় তাহলে তিনি এমামের তকবীর শুনতেন কেমন করে, সেই তকবীর শুনে রুকু-সাজদায় যেতেন কেমন করে, সালাতের একশ'র বেশি নিয়ম-কানুন মোতাবেক সালাহ কায়েম করতেন কীভাবে, কয় রাকাত পড়লেন তা মনে রাখতেন কীভাবে? ধ্যান-মগ্ন হয়ে বাহ্যজ্ঞানহীন হয়ে এমন কি শারীরিক ব্যাথা-যন্ত্রণা পর্যন্ত লোপ পেয়ে সালাহ কায়েম কি সম্ভব? সামান্য সাধারণ জ্ঞান যার আছে তিনিই বুঝবেন- অসম্ভব। অথচ ঘটনা সম্পূর্ণ সত্য [হযরত আলী- আবুল ফজল, পৃষ্ঠা- ১৩২, চার খলিফার জীবন কথা- আব্দুল আজীজ আল নোমান, পৃষ্ঠা- ১০৫, হযরত আলী (রা.)- মাওলানা মুজিবুর রহমান মমতাজুল মোহাদ্দেসীন, পৃষ্ঠা- ৪০৩, আমীরুল মো'মেনিন হযরত আলী (রা.)- সাদেক শিবলী জামান, পৃষ্ঠা- ৪৩৮]।

তাহলে আসল ব্যাপার কী? আসল ব্যাপার হচ্ছে এই- আলী (রা.) ইসলাম কী, ইসলামের সঠিক আকিদা অর্থাৎ এর উদ্দেশ্য কী, উদ্দেশ্য অর্জনের প্রক্রিয়া কী, সালাতের উদ্দেশ্য কী এসবই শিখেছিলেন আর কেউ নয় স্বয়ং আল্লাহর রসুলের (সা.) কাছ থেকে; কাজেই তাঁর আকিদা অবশ্যই সঠিক ছিল। সেই সঠিক আকিদা মোতাবেক তিনি জানতেন যে সালাহ চরিত্র গঠনের প্রশিক্ষণ এবং সামরিক প্রশিক্ষণ; এই প্রশিক্ষণের জন্য দাঁড়ালে, দাঁড়াতে হবে শরীর, মেরুদণ্ড, ঘাড় সোজা করে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে নির্দিষ্ট স্থানে, এমামের তকবিরের সঙ্গে সকলে একত্রে দ্রুত রুকু, এতে'দাল, সাজদা ও সালাম করতে হবে। তিনি এও জানতেন যে সালাতে দাঁড়ালে নিজেকে এমনভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে রাখতে হবে যে এদিক ওদিক তাকানো যাবে না, চোখ বন্ধ করে রাখা যাবে না, কাপড় বা মাথার চুল সরে গেলে তা হাত দিয়ে ঠিক করা যাবে না, কাশি বা হাইতোলা যথাসম্ভব রোধ করতে হবে, এমন কি সাজদার স্থানে ধূলাবালি বা কপালে ব্যাথা লাগতে পারে এমন পাথর-কুচি বা কাঁকর থাকলেও ফু দিয়ে বা হাত দিয়ে সরানো যাবে না, এক পায়ে একটু বেশি ভর দেওয়া চলবে না। এর যে কোন একটি করলেই সালাহ ক্ষতিগ্রস্ত বা নষ্ট হবে; অর্থাৎ এক কথায় সামরিক শৃঙ্খলা। পা থেকে তীর টেনে বের করার সময় আলীর (রা.) নিশ্চয়ই তীব্র ব্যাথা লেগেছিল, কিন্তু তিনি দাঁতে দাঁত চেপে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন সালাহ নষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ভয়ে। এই ঘটনাকে আলীর (রা.) ধ্যান-মগ্ন হয়ে সালাহ কায়েমের প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপিত করা যায় শুধু সাধারণ জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে লোপ পেলে এবং আল্লাহর লা'নত যাদের ওপর পড়ে তাদের যে সব শাস্তি হয় তার মধ্যে অন্যতম হলো আকল (আক্কেল) অর্থাৎ সাধারণ জ্ঞান (Common sense) লোপ পাওয়া, তাই হলে।

আলীর (রা.) এই ঘটনার সঙ্গে আরও একটি ঘটনার কথা উল্লেখ না করে পারছি না। ইসলামের প্রকৃত সালাহ যে কী রকমের চরিত্র সৃষ্টি করতো, মো'মেনের চরিত্রের মধ্যে ঐক্য, শৃঙ্খলা, আনুগত্য ও হেজরতের গুণের সঙ্গে সঙ্গে যে কি কঠিন সবরও সৃষ্টি করত তার একটি উদাহরণ এই ঘটনাটি।

বনি আউস বিন লাইস গোত্রের গালীব বিন আবদুল্লাহ আল কালবিকে (রা.) আল্লাহর রসুল (সা.) একদল অশ্বারোহী দিয়ে প্রেরণ করলেন বনি আল-মুলাওয়াহ গোত্রকে আক্রমণ করার জন্য। ঐ গোত্র তখন আল কাদীদ নামক স্থানে অবস্থান করছিল। এই দলে ইয়াকুব বিন ওতবা আল মুগীরা সানিল (রা.) নামে এক সাহাবা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বিশ্বনবীর আদেশ ছিল ঐ গোত্রকে রাত্রে আক্রমণ করার। অশ্বারোহী মোজাহেদ দল সূর্যাস্তের সময় আল কাদীদ উপত্যকায় এসে পৌঁছলো। বনি মুলাওয়াহর অবস্থান ও অন্যান্য খবরাখবরের জন্য ইয়াকুব বিন ওতবাকে (রা.) পাঠানো হলো। ঐ গোত্র যে উপত্যকায় অবস্থান করছিল তার পাশেই একটি পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে ইয়াকুব (রা.) সাবধানে ওদের পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন।

এরই মধ্যে ঐ পাহাড়ের কাছেই একটি তাবু থেকে একজন লোক বেরিয়ে এসে চারদিক দেখতে লাগলো এবং হঠাৎ সে ইয়াকুবকে (রা.) দেখে ফেললো। কিন্তু সন্ধ্যা এত গাঢ় হয়ে গিয়েছিল যে সে বুঝলো না যে ওটা মানুষ না অন্য কিছু। সে তাবুর ভেতরে তার স্ত্রীকে ডেকে বললো- আমি একটি কিছু দেখতে পাচ্ছি যা দিনে ওখানে দেখি নি। দেখতো কুকুর আমাদের কোন জিনিস ওখানে নিয়ে ফেলেছে কিনা। স্ত্রী তাবুর ভেতরের সব জিনিস খোঁজ করে বললো- না এখানে সব ঠিক আছে। তখন লোকটি তার স্ত্রীকে বললো- তাহলে আমার ধনুকটা আর দু'টো তীর নিয়ে এসো। স্ত্রী তীর-ধনুক নিয়ে এলে লোকটি ইয়াকুবকে (রা.) লক্ষ্য করে একটি তীর ছুড়লো। তীর এসে ইয়াকুবের (রা.) পাঁজড়ে লাগলো। ইয়াকুব (রা.) জানেন যে তিনি বিন্দুমাত্র নড়লেই লোকটি বুঝবে যে ওটা কোন মানুষ এবং সঙ্গে সঙ্গে হৈ চৈ করে তার গোত্রকে সতর্ক করে দেবে যে শত্রুপক্ষের কোন লোক গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছে। ইয়াকুব (রা.) অতি সাবধানে না নড়ে একহাত দিয়ে তীরটি পাঁজড় থেকে টেনে বের করে রেখে দিলেন। বনি মুলাওয়াহর লোকটি তবুও নিঃসন্দেহ না হয়ে তার দ্বিতীয় তীরটি ছুড়লো। এবারের তীর ইয়াকুবের (রা.) কাঁধে এসে ঢুকলো। এবারও তিনি না নড়ে আস্তে সাবধানে তীরটি টেনে খুলে রাখলেন। এবার ঐ লোকটি তার স্ত্রীকে বললো আমার দু'টো তীরই ঠিক লেগেছে। ওটা যদি কোন দলের গুপ্তচর বা জীবন্ত কিছু হতো তবে নিশ্চয় নড়তো। সকালে ঐ তীর দু'টো পাহাড়ের ওপর থেকে নিয়ে এসো- নইলে আমাদের কুকুর হয়তো কামড়িয়ে নষ্ট করবে।

ইয়াকুবের (রা.) এই যে অবিশ্বাস্য সহ্যশক্তি, সবর, একটুও না নড়ে নিজের শরীর থেকে দু-দু'টি তীর টেনে বের করা এটি কোথা থেকে এলো? নিঃসন্দেহে এটি সালাতের শিক্ষা, সালাতের প্রশিক্ষণের ফল। ঠিক যে কারণে আল্লাহর রসুল (সা.) সালাতে দাঁড়ানো অবস্থায় আলীর (রা.) পা থেকে তীর টেনে বের করতে বলেছিলেন। অবশ্য আলী (রা.) ও ইয়াকুবের (রা.) ঐ সহ্যশক্তির পেছনে সালাতের শৃঙ্খলার প্রশিক্ষণ ছাড়াও সঠিক আকিদারও তেজ ছিল।

যে উদ্দেশ্যে আল্লাহর নবীর জীবনী থেকে এই ঘটনাটি বর্ণনা করলাম তা এখানেই শেষ; সালাহ কায়েমের ফল। কিন্তু ঘটনাটার বাকি অংশটুকুও বর্ণনা করার লোভ

সংবরণ করতে পারছি না, যদিও তা প্রাসঙ্গিক নয়। কারণ ঘটনাটি থেকে সালাতের প্রশিক্ষণ ছাড়াও আরও দু'টি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় জানা যায়। একটি ইসলামের জেহাদ, কেতাল, যুদ্ধ যে আত্মরক্ষামূলক নয় বরং প্রচণ্ডভাবে আক্রমণাত্মক এ কথার অকাট্য প্রমাণ এবং দ্বিতীয়টি মো'মেনদের সাহায্য করা আল্লাহর দায়িত্ব (সুরা রূম ৪৭) একথার সত্যতা।

ঘটনাটার পরের বর্ণনা হচ্ছে এই যে ইয়াকুবের (রা.) ঐ পর্বতসম সবরের ফলে শত্রুপক্ষ মুসলিম বাহিনীর উপস্থিতি সম্বন্ধে অজ্ঞ রয়ে গেল এবং খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। মোজাহেদ বাহিনী সারারাত্রি অপেক্ষা করে শেষরাত্রে মুলাওয়াহ গোত্রের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করে তাদের বেশ কিছু লোক হত্যা করে তাদের উট, দুম্বা, ছাগল এবং অন্যান্য সম্পদ নিয়ে রওনা দিলো। কিন্তু ইতিমধ্যেই ঐ গোত্রের লোকজন (গোত্রটি বেশ বড় গোত্র ছিল) সব একত্র হয়ে তাদের পিছু নিলো। মোজাহেদ বাহিনীর গতি স্বভাবতই শত্রুর চেয়ে অনেক কম ছিল কারণ তাদের সঙ্গে বহু উট, ঘোড়া, ছাগল ইত্যাদি ছিল আর শত্রুদের সঙ্গে এসব কিছুই ছিল না এবং অতি শীঘ্রই তারা মোজাহেদের কাছে এসে গেল। যখন বনি-মুলাওয়াহ গোত্রের অসংখ্য লোক মোজাহেদদের ধাওয়া করে প্রায় ধরে ফেলেছে তখন ঐ গোত্র ও তাদের মধ্যে শুধু কুদাইদের ওয়াদি। আরবে নিম্নস্থানকে ওয়াদি বলা হয়। ঠিক এমনি সময় মেঘ নেই, বৃষ্টি নেই, কোথা থেকে বন্যার মতো পানি এসে ওয়াদি ভরে গেল। বনি-মুলাওয়াহ গোত্রের একটি মানুষও ঐ ঢলের পানি পার হয়ে ওপারে যেতে পারলো না; তারা অসহায় হয়ে ওয়াদির এপারে দাঁড়িয়ে রইল এবং মোজাহেদ বাহিনী সমস্ত টাকা পয়সা, উট, দুম্বা, ঘোড়া, ছাগল ইত্যাদি নিয়ে চলে গেল এবং মদিনা পৌঁছে আল্লাহর রসুলের (সা.) দরবারে পেশ করলো (সিরাতে রসুলাল্লাহ, মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক, অনুবাদ A. Guillaume পৃঃ ৬৬০-৬৬১)।

ইসলামের সঠিক প্রকৃত আকিদার বিকৃতির ফলে ঈমানের, মো'মেন হবার সংজ্ঞার মধ্যেই যে জেহাদের শর্ত; ঈমান আনার পরই যে কাজের স্থান সেই জেহাদকে ত্যাগ করার পর ঐ কাজকে যথার্থ প্রমাণ করার জন্য প্রচার করা আরম্ভ হলো যে, ইসলামের জেহাদ, যুদ্ধ শুধু আত্মরক্ষামূলক; ইসলাম আক্রমণাত্মক যুদ্ধ সমর্থন করে না। এই প্রচার ইসলামের আকিদার মর্মমূলে যেয়ে আঘাত করলো। ইসলামে জেহাদ, সর্বাত্মক প্রচেষ্টা এবং কেতাল অর্থাৎ সশস্ত্র যুদ্ধ শুধু আত্মরক্ষামূলক একথা তেরশ' বছর আগে প্রচার করা শুরু হয়েছিল জেহাদ ছেড়ে দেবার কৈফিয়ত হিসাবে যথার্থতা প্রমাণ করার জন্য। তারপর জেহাদ ত্যাগ করার অমার্জনীয় অপরাধের শাস্তি হিসাবে উম্মতে মোহাম্মদীর হাত থেকে কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নিয়ে ইউরোপের খ্রিষ্টান জাতিগুলোর হাতে তুলে দিয়ে এই জাতিকে যখন আল্লাহ মো'মেনের গণ্ডী থেকে বহিষ্কার করে পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত জাতিগুলোর পদাঘাত, লাথীর বস্তুতে পরিণত করে দিলেন, আল্লাহর লা'নতের ফলে হীনম্মন্যতায় এই জাতির আত্মা পর্যন্ত আপ্লুত হয়ে গেল, তখন তারা ঐ কথা পৃথিবীর অন্যান্য জাতিকেও বলতে শুরু করলো। তারা করজোড়ে অন্যান্য জাতিকেও বলতে লাগলো যে আপনারা যে এই মুসলিম জাতিকে অপবাদ দেন যে, আমরা তলোয়ারের জোরে পৃথিবীতে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছি, এটি মোটেই সত্য নয়। আমরা অতি নিরীহ গোবেচারা

জাতি, আমরা কখনই অন্যকে আক্রমণ করি না। এই দেখুন আমাদের হাতে কোন অস্ত্র আছে? দেখুন এ হাতে কোন অস্ত্র নেই; আছে তসবিহ্। তবে নেহায়েৎ যদি কেউ আমাদের আক্রমণ করে তবে আমরা আত্মরক্ষার চেষ্টা করি মাত্র।

যে ঘটনাটার কথা পেছনে উল্লেখ করেছি তাতে আল্লাহর রসুল (সা.) হুকুম দিয়েছিলেন শত্রু গোত্রটাকে রাত্রে আক্রমণ করতে, অর্থাৎ ঘুমন্ত অবস্থায়। মোজাহেদ দল তাই করেছিলেন, বনি-মুলাওয়াহ গোত্রকে ঘুমিয়ে পড়ার সময় দিয়েছিলেন এবং শেষরাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় আক্রমণ করেছিলেন। আদেশটি ছিল স্বয়ং আল্লাহর রসুলের (সা.)। শুধু এই ঘটনাই নয়। নবীর জীবিত অবস্থায় খন্দকের যুদ্ধ ও তার পৃথিবী থেকে চলে যাবার পর বিদ্রোহীদের আক্রমণ থেকে মদিনাকে রক্ষার যুদ্ধ; এই দু'টি ছাড়া আর কোন যুদ্ধই আত্মরক্ষামূলক ছিল না। এর পর ইসলামের যুদ্ধ, জেহাদ ও কেতালকে আত্মরক্ষামূলক বলে প্রচার করা কী করে সম্ভব! ঐ যুদ্ধ দু'টিও আসলে সম্পূর্ণভাবে আত্মরক্ষামূলক নয়, সামগ্রিক যুদ্ধের মধ্যে কখনও কখনও আক্রমণ প্রতিহত করতে হয়, ওটা গোটা যুদ্ধেরই একটি পর্যায়।

অন্য যে শিক্ষা এই ঘটনা থেকে পাই তা হচ্ছে কোর'আনে দেয়া আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পালন। আল্লাহ বলেছেন- আল্লাহ মো'মেনদের ওয়ালী অর্থাৎ অভিভাবক (সুরা আল এমরান ৬৮)। আরও বলেছেন- মো'মেনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব (সুরা রূম ৪৭)। মোজাহেদ বাহিনীর পেছনে বিপুল সংখ্যক শত্রু তাড়া করে প্রায় এসে পড়েছে, তাদের তুলনায় মোজাহেদরা অতি অল্প সংখ্যক, মোজাহেদরা একটি নিম্নভূমি পার হয়ে ওপারে উঠেছেন, শত্রুরা এপারে এসে গেছে; এমনি সময় মেঘ নেই, বৃষ্টি নেই আল্লাহর আদেশে হঠাৎ কোথা থেকে বন্যার পানির ঢল এসে ঐ নিম্নভূমি প্লাবিত করে দিলো। একটি শত্রুও পার হতে পারলো না। আল্লাহ তাঁর দায়িত্ব পালন করলেন। এ ঘটনাটি আল্লাহর নবী মুসার (আ.) ঘটনা মনে করিয়ে দেয়। মুসার (আ.) নেতৃত্বে বনি-এসরাঈলীদের রক্ষা করার জন্য সমুদ্র দু'ভাগ করে তাদের পার করে দিয়ে শত্রুদের ডুবিয়ে মারার মো'জেজা। সেটা ছিল নবীর মো'জেজা আর এ ঘটনা শ্রেষ্ঠ নবীর আসহাবদের মো'জেজা, প্রকৃত উম্মতে মোহাম্মদীর মো'জেজা।

আমরা আবার সালাতে ফিরে যাচ্ছি। পৃথিবীর সব জাতিই বর্তমানে দু'ভাগে বিভক্ত। সামরিক ও বেসামরিক (Military & Civilian)। বেসামরিক ভাগ সরকার গঠন করে নিজেরা আইন-কানুন, দণ্ডবিধি, অর্থনীতি ইত্যাদি তৈরি করে সেই মোতাবেক দেশ শাসন করে অর্থাৎ শেরক ও কুফরি করে, আর সামরিক ভাগ বেসামরিকদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সেনা ছাউনীতে থেকে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেয় দেশকে রক্ষা করার, প্রয়োজনে অর্থাৎ বেসামরিকদের সিদ্ধান্ত হলে অন্য দেশ-জাতিকে আক্রমণ করার জন্য। বর্তমানে নিজেদের মূল থেকে, আকিদা থেকে, দীন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, আল্লাহ-রসুলের দেখানো দিক নির্দেশনার (হেদায়াহর) বিপরীতমুখে চলমান এই মুসলিম জাতিও অন্যদের অনুকরণে ঐ দু'ভাগে বিভক্ত। কিন্তু আল্লাহর শেষ নবী যে জাতি গঠন করলেন, যার নাম উম্মতে মোহাম্মদী, এটার মধ্যে কোন ভাগ নেই; সম্পূর্ণ জাতিটাই সামরিক। এ জাতির সর্বোচ্চ নেতা থেকে

নিম্নতম মানুষটি পর্যন্ত প্রত্যেকে মোজাহেদ, যোদ্ধা। যে যোদ্ধা নয় এ জাতিতে, এই উম্মাহতে তার স্থান নেই। এ জাতিতে নির্বাচিত সংসদ (Parliament) নেই কারণ আইন তৈরির কোন প্রয়োজন নেই; আল্লাহর দেয়া আইন-কানুন দণ্ডবিধি, অর্থনীতি সমস্তই মজুদ আছে; এবং আছে শুধু এমাম এবং এমামের নিযুক্ত স্থানীয় আমীররা (Commanders) আল্লাহর ঐ আইন কানুন, দণ্ডবিধি, অর্থনীতি ইত্যাদি অর্থাৎ দীনুল ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত কার্যকরী রাখার জন্য। এক কথায় সমস্ত জাতিটি একটি সামরিক বাহিনী, নারী-পুরুষ প্রত্যেকে এক একটি সৈনিক, মোজাহেদ, যোদ্ধা। এই সামরিক বাহিনীর প্রশিক্ষণ হলো সালাহ।

বর্তমানে পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশ-জাতিগুলোতে যে বেসামরিক ও সামরিক (Civil & Military) বিভক্তি আছে তাতে বেসামরিক ভাগের প্রধান থাকেন প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী এবং সামরিক ভাগের প্রধান থাকেন- প্রধান সেনাপতি (Commander in Chief)। বেসামরিক লোকজন যখন প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রীর সামনে যায় তখন তারা সম্মুখে ঝুঁকে, জুবুথুবু, নুব্জ হয়ে সম্মান প্রদর্শন করে; আর অন্য ভাগের সৈনিকেরা যখন প্রধান সেনাপতির সামনে যায় তখন সে লোহার রডের মতো পিঠ, ঘাড় সোজা করে দৃপ্তপদে খট্ খট্ করে সেনাপতির সামনে যায় এবং যেয়ে তড়াক করে স্যালুট করে এবং সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আদেশের অপেক্ষা করে এবং আদেশ হলে প্রাণদিয়ে তা পালন করে। এই উম্মতে মোহাম্মদীতে যেহেতু ঐ বিভক্তি নেই, সম্পূর্ণ জাতিটাই সামরিক, প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী নেই, আছে শুধু এমাম (Commander in Chief) এবং আমীরগণ, (আমীর শব্দের আক্ষরিক অর্থই হলো আদেশদাতা, (Commander) সেহেতু তার সালাহ হবে সৈনিক, যোদ্ধার মত।

বেসামরিক লোকজন প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী সামনে যেয়ে জুবু থুবু, নুব্জ নত হয়ে সালাম দেয় কিন্তু ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থের প্রয়োজনে প্রেসিডেন্টের বা প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধাচারণ করে তাদের গদী থেকে অপসারণের চেষ্টা করে; কিন্তু যে সৈনিকরা দৃপ্তপদে সেনাপতির সামনে যেয়ে সোজা হয়ে মাথা উঁচু করে সালাম দেয়, তারা কখনও সেনাপতির কোন আদেশের বিরুদ্ধে তো যায়ই না, তার আদেশের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ইসলামে প্রকৃত সালাহ কেমন তা সহীহ হাদিসগুলো থেকে সংগ্রহ করলেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে বর্তমানে অন্যান্য ধর্মের অনুকরণে গোঁজামিল দেবার চেষ্টায় সালাতের যে চেহারা হয়েছে তা প্রকৃত সালাহ থেকে কতদূর। এই হাদিসগুলো একত্র করলে দেখা যায় যে, সঠিক এবং সম্পূর্ণভাবে সালাহ আদায় করলে একশ'রও বেশি নিয়ম-কানুন লক্ষ্য রেখে, সেগুলো যথাযথভাবে পালন করতে হয়। ইসলামের প্রকৃত সালাতে যতগুলো নিয়ম-কানুন কঠিনভাবে পালন করতে হয় পৃথিবীর কোনও সামরিক বাহিনীর কুচকাওয়াজেও ততগুলো নিয়ম-কানুন পালন করতে হয় না। আল্লাহর রসুল (সা.) বলেছেন- তোমরা সালাহ পূর্ণভাবে কায়েম কর, কারণ আল্লাহ পূর্ণ ব্যাতিত সালাহ কবুল করেন না [হাদিস- আবু হোরায়রা (রা.) থেকে]। এই নিয়ম-কানুনের, পদ্ধতির অনেকগুলো বর্তমানে যে নামাজ পড়া হয়

তার মধ্যেই চালু আছে, যেমন শরীর পাক থাকা, নামাজের জায়গা পাক থাকা, কাবার দিক মুখ করে দাঁড়ানো ইত্যাদি সাধারণ নিয়ম-কানুন যেগুলো না হলে নামাজের আর কিছুই থাকে না। কিন্তু সালাতের মধ্যে যে সব নিয়ম-কানুন, পদ্ধতি সালাহকে সামরিক রূপ দেয় সেগুলোকে বাদ দেয়া হয়েছে, সালাতের প্রাণকেই ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। কাজেই এখানে শুধু সেই নিয়ম-কানুনগুলো উল্লেখ করব। সালাতের সঠিক অবস্থাগুলো ভাল করে বোঝাবার জন্য ছবি সংযোজন করা হলো।

সালাতের সঠিক অবস্থাগুলো ভালো করে বোঝানোর জন্য কয়েকটি ছবি সংযোজন করা হলো

দাঁড়ানোঃ আল্লাহর রসুল (সা.) বলেছেন, পিঠ এমনভাবে সোজা করে দাঁড়াবে যাতে সমস্ত হাড়ের গাইটগুলো (গ্রন্থি) আপন আপন জায়গায় বসে যায়। - রেফায়াহ বিন রা'ফে বিন মালিক (রা:) থেকে ইমাম ইবনে হিব্বান, ইমাম মাহমুদ।

অর্থাৎ দাঁড়াতে হবে এমন সোজা হয়ে যাতে মাথা থেকে পা পর্যন্ত সম্পূর্ণ শরীর রডের মতো একটি সরলরেখায় পরিণত হয়। দাঁড়ানোর সময় দুই পায়ের পাতা সমান্তরালভাবে থাকবে, উভয়ের মধ্যে যার যার হাতের চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁক রাখতে হবে। দুই হাত দৃঢ়ভাবে মুষ্ঠিবদ্ধ থাকবে। মহানবী বলেছেন, সালাতের জন্য টুপি পরা বা পাগড়ী বাঁধা প্রয়োজনীয় নয়। - বোখারি

তাকবীরঃ সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পর দুই হাত উঠিয়ে দুই বৃদ্ধাঙ্গুলি দুই কানের লতিতে স্পর্শ করাতে হবে এবং দুই হাতের তালু কোণাকোণীভাবে কেবলার দিকে রাখতে হবে।

হাত বাঁধাঃ অতঃপর ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কব্জি দৃঢ়ভাবে ধরতে হবে, বাম হাতও দৃঢ়ভাবে মুষ্ঠিবদ্ধ থাকবে। দুই হাত আবদ্ধভাবে নাভির নিচে স্থাপন করতে হবে।

রুকুঃ মহানবী বলেছেন, রুকুতে পিঠকে পিছন ও ঘাড়ের বরাবর সোজা রাখতে হবে। এ সময় মাথা নীচুও করা যাবে না, উঁচু করা যাবে না। -আয়েশা (রা.) থেকে মুসরিম।

রুকুতে দুই হাঁটু দৃঢ়ভাবে ধরতে হবে এবং দুই বাহুকে সম্পূর্ণ সোজা রাখতে হবে।

সেজদাঃ সেজদায় দুই বাহুকে দেহের দুই পার্শ্ব হতে পৃথক রাখতে হবে এবং দুই পায়ের আঙ্গুলগুলোকে কা'বার দিকে মুড়িয়ে দিতে হবে (আবু দাউদ, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ)। এ সময় দুই পায়ের পাতা সম্পূর্ণ খাড়া ও সমান্তরালভাবে থাকবে এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব অপরিবর্তিত অর্থাৎ চার আঙ্গুল থাকবে। সেজদাহ অবস্থায় হাঁটু এবং কনুইয়ের মাঝে এতটুকু ফাঁক রাখতে হবে যাতে একটি ছাগলছানা সহজেই এপাশ থেকে ওপাশে চলে যেতে পারে।

সেজদা-তে নাক ও কপাল সমভাবে মুসাল্লায় স্থাপন করতে হবে। মেরুদণ্ড একদম সোজা হবে, দুই হাত মাথার দুই পাশে কান থেকে সামান্য দূরে রাখতে হবে। হাত দুটি পরস্পর সমান্তরালভাবে কা'বামুখী থাকবে। দুই তালুর মাথার নিকটবর্তী ভাগে এতটুকু পরিমাণ উঁচু রাখতে হবে যাতে সেখানে একটি করে সুপারি রাখা যায়।

সেজদা'র সময় দুই পায়ের পাতা সমান্তরালভাবে খাড়া করে রাখতে হবে এবং পায়ের আঙ্গুলগুলো কেবলামুখী করে রাখতে হবে। দাঁড়ানোর সময় যেমন দুই পা যার যার হাতের চার আঙ্গুল ফাঁক রাখতে হবে, সেজদাহ'র সময়ও দুই পায়ের মধ্যে সেই চার আঙ্গুল ফাঁকই রাখতে হবে।

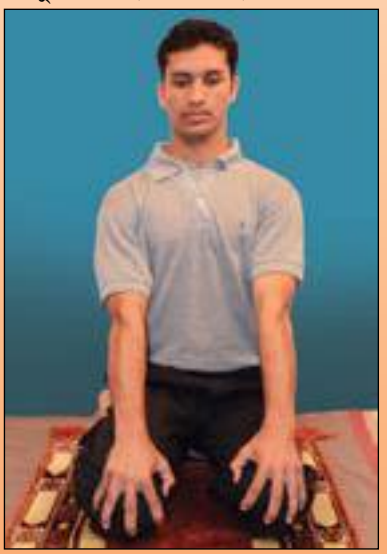

বসা: সেজদা হতে উঠে এমনভাবে সোজা হয়ে বসতে হবে যাতে মাথা, ঘাড়, মেরুদণ্ড একই সরলরেখায় থাকে। দুই বাহু সম্পূর্ণ সোজা ও দৃঢ় থাকবে। দুই হাত দিয়ে দুই হাঁটুকে রুকুর ন্যায় দৃঢ়ভাবে ধরতে হবে।

রুকু ও সেজদায় দুই হাত দিয়ে দুই হাঁটুকে এমনভাবে ধরতে হবে যেভাবে বাজপাখি তার শিকার ধরে। দুই জানু পরস্পর সমান্তরাল থাকবে।

বসা অবস্থায় ডান পায়ের পাতা সম্পূর্ণ খাড়া থাকবে এবং আঙ্গুলগুলো মুড়িয়ে কেবলামুখী করে রাখতে হবে। এসময় বাম পা শোয়ানো অবস্থায় থাকবে। দেহের সম্পূর্ণ ভর থাকবে বাম পায়ের উপরে।

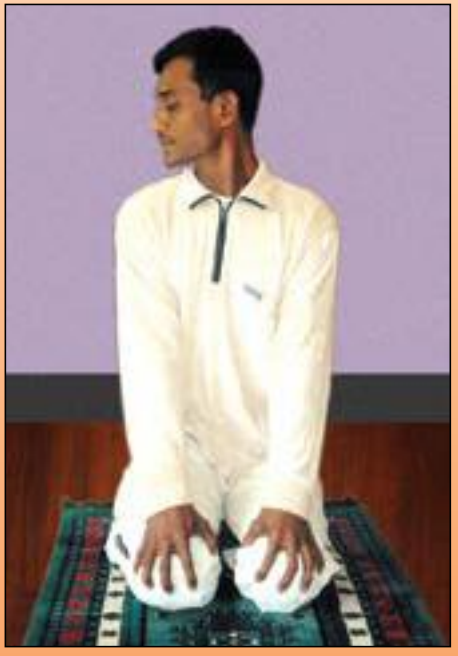

সালাম ফেরানোঃ সালাম ফেরানোর সময় ঘাড় একদম সোজা থাকবে, শুধু মুখমণ্ডল কাঁধ বরাবর সম্পূর্ণভাবে ঘুরে যাবে। এসময় শরীর বিন্দুমাত্র নড়বে না বা ঘুরবে না।

মেয়েদের সালাহ্

ইবলিসের প্ররোচনায় সঠিক, প্রকৃত ইসলামের আকীদা বিকৃত ও বিপরীতমুখী হয়ে যাওয়ার ফলে ইসলামের প্রকৃত সালাহ্ ও তার উদ্দেশ্যও বিপরীতমুখী হয়ে গেছে। এর অন্যতম হলো পুরুষ ও নারীর সালাহ্-কে ভিন্ন করে দেয়া হয়েছে। মেয়েদের সালাতের প্রক্রিয়া, পুরুষের প্রক্রিয়া থেকে কিছুটা অন্যরকম করে দেয়া হয়েছে; যেমন বুকের ওপর হাত বাঁধা, সেজদার সময় মেঝের সাথে মিশে থাকা ইত্যাদি। কিন্তু প্রকৃত ইসলামের সালাতে পুরুষ-নারীর প্রক্রিয়ার কোন তফাৎ নেই, উভয়ের একই রকম।

পুরুষ ও মেয়েদের সালাতে কোনো তফাৎ নেই (বোখারী)।

ইসলামের এই প্রকৃত সালাতের শিক্ষাই উম্মে আম্মারা, খাওলা, হাফসা, আনীসা, সুফিয়া, হামীদার (রাঃ) মত হাজারও মহিলা যোদ্ধা সৃষ্টি করেছিলো যাদের সামনে আসতে মহাবীর শত্রুরও আত্মায় কাঁপুনি সৃষ্টি হতো। এই প্রকৃত সালাতের প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই আল্লাহর রসুল এমন এক দুর্দমনীয় সুশৃংখল অজেয় যোদ্ধার বাহিনী ও সেই বাহিনীকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রচণ্ড তুফানের মত চালনা করার উপযুক্ত সেনাপতির দল তৈরি করে গিয়েছিলেন যারা পরবর্ত্তী সময়ে দুই হাতে দুই বিশ্বশক্তিকে চুরমার কোরে অর্ধেক পৃথিবীতে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলো।

আল্লাহর রসুল বলেছেন– তোমরা আমাকে যেভাবে সালাহ্ কায়েম করতে দেখ ঠিক সেইভাবে সালাহ্ কায়েম কর (সহিহ্ সনদে ইবনে আবু শায়বাহ)। এখানে তিনি মেয়েদের সালাহ্ অন্য রকম হওয়ার কোন ইঙ্গিত দেন নাই। রসুলের মত করে সালাহ্ কায়েম করা অর্থাৎ পুরুষের মত করা। বর্তমানে মেয়েদের সংকুচিত হয়ে মাটির সাথে মিশে যে সালাহ্ প্রচলিত রয়েছে তা নেয়া হয়েছে মাত্র দুইটি হাদীস থেকে; তার একটা মুরসাল অর্থাৎ ছিন্নসূত্র ধারা, প্রমাণের অযোগ্য; অপরটি দইফ, দুর্বল (আলামা ও মুহাদ্দিস মো. নাসির উদ্দিন আলবানী)।

সালাতের এই প্রাণহীন দুরবস্থা কেন হলো: কেমন করে হোল?

পেছনে বলে এসেছি, প্রমাণ করে এসেছি যে রসুলকে আল্লাহ যে দায়িত্ব দিয়ে পৃথিবীতে পাঠালেন তা হচ্ছে: (১) সমস্ত পৃথিবীতে তাঁর (আল্লাহ) দেয়া সঠিক দিক-নির্দেশনা (হেদায়াহ) ও সত্যদীন (দীনুল হক) প্রতিষ্ঠা করা (সুরা সুরা ফাতাহ ২৮, তওবা ৩৩, সফ্ ৯)। (২) ঐ কাজটি করার নীতি আল্লাহ নির্ধারণ করে দিলেন সংগ্রাম (জেহাদ) ও কেতাল (সশস্ত্র সংগ্রাম) (সুরা বাকারা ২১৬)। (৩) ঐ জেহাদ ও কেতাল করে জয়ী হওয়ার মত চরিত্র গঠনের জন্য, প্রশিক্ষণের জন্য ফরদ করে দিলেন সালাহ্। সালাহ্ যে চরিত্র গঠন করবে, যে গুণগুলি মুসল্লিদের চরিত্রে সৃষ্টি করবে সেগুলিকে চরিত্রের মধ্যে গেঁথে দেয়ার জন্য, প্রোথিত করার জন্য অর্থাৎ কায়েম করার জন্য আল্লাহ দিনে পাঁচবার সালাহ্ কায়েম করার

আদেশ দিলেন। এই হল রেসালাত, জেহাদ ও সালাহ্ সম্বন্ধে সঠিক আকীদা। এই আকীদাই ছিলো আল্লাহর রসুলের ও তাঁর আসহাব মোজাহেদের। তাদের এই আকীদা ছিলো বলেই আল্লাহর রসুল তাঁর আসহাব, মোজাহেদের সঙ্গে নিয়ে নয় বছরের মধ্যে ১০৭ টারও বেশি যুদ্ধ করে সমস্ত আরব উপদ্বীপটিতে আল্লাহর দেয়া সঠিক দিক নির্দেশনা (হেদায়াহ) ও সত্যদীন (দীনুল হক) প্রতিষ্ঠা করলেন। তারপর আল্লাহর ডাকে তিনি পৃথিবী থেকে চলে গেলেন; যাবার সময় তিনি তাঁর নিজের ওপর আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব তাঁর হাতে গড়া, তাঁর নিজের প্রশিক্ষণ দেয়া উম্মাহর ওপর অর্পণ করে গেলেন এবং তা হচ্ছে বাকি পৃথিবীতে ঐ হেদায়াহ ও দীনুল হককে প্রতিষ্ঠা করে সম অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, অশান্তি বিলুপ্ত করে দিয়ে শান্তি (ইসলাম) প্রতিষ্ঠা করে আল্লাহকে দেয়া ইবলিসের চ্যালেঞ্জে আল্লাহকে জয়ী করা। আল্লাহর রসুলের উম্মাহ তাদের হৃদয় দিয়ে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব উপলব্ধি করেছিলেন, তাই নেতার ইন্তেকালের পরই তারা তাদের পার্থিব সমস্ত কিছু, ব্যবসা-বাণিজ্য, ঘর-বাড়ি, ক্ষেত-খামার, স্ত্রী-পুত্র সব কিছু ত্যাগ করে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাইরের পৃথিবীর বুকে বন্যার ঢলের মত ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তারা ভুলেন নাই যে তাদের মহান নেতা তাদের সতর্ক করে বলেছিলেন যে, যে আমার সুন্নাহ ত্যাগ করবে সে আমার কেউ নয়, এবং সেই সুন্নাহ হচ্ছে এই সুন্নাহ। তারা এও ভুলেন নাই যে আল্লাহও পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন যে এই জেহাদ ত্যাগ করলে আল্লাহ এই জাতিকে কঠিন শাস্তি দিয়ে অন্য জাতির দাস বানিয়ে দেবেন (কোরআন সুরা তওবা- ৩৮, ৩৯)।

দিনে পাঁচবার সালাতের মাধ্যমে অর্জিত গুণগুলি, অর্থাৎ সকলের একই উদ্দেশ্য, একই লক্ষ্য, লৌহকঠিন ঐক্য, ইস্পাত কঠিন শৃংখলা, নেতার আদেশের সঙ্গে সঙ্গে, বিনা প্রশ্নে দ্বিধাহীনভাবে মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ার আনুগত্য ও পর্বতের মত অটল সংকল্পের দৃঢ়তা (সবর) নিয়ে উম্মতে মোহাম্মদী পৃথিবীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। আকীদার সঠিকতা অর্থাৎ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে সঠিক ধারণা ও তা অর্জনের সঠিক প্রক্রিয়া ও সালাতের মাধ্যমে অর্জিত চরিত্রের ফলে ঐ উম্মাহ মাত্র ৬০/৭০ বছরের মধ্যে অর্ধেক পৃথিবীতে আল্লাহর দেয়া হেদায়াহ (সঠিক দিক নির্দেশনা) ও দীনুল হক (সত্যদীন) প্রতিষ্ঠা করেছিলো। যার ফলে ঐ অর্ধেক পৃথিবী ন্যায়ে, সুবিচারে ব্যক্তিগত ও সামাজিক নিরাপত্তায় ও শান্তিতে, ইসলামে ভরে গিয়েছিলো। তারপর দুর্ভাগ্যক্রমে এই উম্মাহ তার ওপর আল্লাহর ও রসুলের দেয়া দায়িত্ব ভুলে গিয়ে দীন প্রতিষ্ঠার জেহাদ, যুদ্ধ ত্যাগ করে সাধারণ রাজা-বাদশাহদের মত রাজত্ব করতে আরম্ভ করলো। যুদ্ধই যখন ত্যাগ করা হল তখন সেই যুদ্ধের প্রশিক্ষণও বিকৃত হয়ে যাবে তা স্বাভাবিক কথা। উম্মতে মোহাম্মদীর অস্তিত্বের কারণ সম্বন্ধে আকীদা বিকৃত হয়ে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করে ইবলিসকে পরাজিত করে আল্লাহকে জয়ী করা থেকে বদলে যেমন রাজত্ব করা হয়ে গেলো, তেমন সালাতের উদ্দেশ্য মোজাহেদ চরিত্র গঠন থেকে বদলে উপাসনা করা হয়ে গেলো। কাজেই সালাতের সেই কঠিন নিয়ম-কানুন, পালন করে সালাহ্ কায়েম করা থেকে বদলে যেমন তেমন করে আঁকা-বাঁকা লাইনে ঝুঁকে, জুবু-থুবু হয়ে দাঁড়িয়ে, পিঠ বাঁকা করে রুকু-সেজদা করে নামায পড়ায় পর্যবসিত হল, এবং

এখন সমস্ত মোসলেম দুনিয়াতে এই প্রাণহীন নামায পড়া হয়, সালাহ্ কায়েম করা হয় না। আল্লাহ তাঁর কোরআনে মোনাফেকদের সালাহ্ কেমন সে সম্বন্ধে বলছেন- মোনাফেকরা ঢিলাঢালা হয়ে সালাতে দাঁড়ায়। শব্দ ব্যবহার কোরেছেন 'কুসালা' যার অর্থ ঢিলা, ভিরুতা, সাহসহীন, নির্জীব অবস্থা (সুরা নেসা- আয়াত ১৪২)। আবার সুরা মাউনের ৪ এবং ৫নং আয়াতে হতভাগ্য, অভিশপ্ত বলেছেন তাদের যারা তাদের সালাতে অসতর্ক, যেমন- তেমন করে আদায় করে। আল্লাহর এবং রসুলের কথার কষ্ঠি পাথরে বিচার করলে আজ সমস্ত পৃথিবীর সালাহ্ হতভাগ্য, অভিশপ্তদের সালাতের মত।

আমরা হেযবুত তওহীদ ইসলামের সেই প্রকৃত সালাহ্ গ্রহণ করেছি ও তা পূর্ণভাবে কায়েম করার চেষ্টা কোরছি। আল্লাহ আমাদের সমস্ত গোনাহ-ত্রুটি মাফ করে আমাদের সালাহ্ কবুল করুন। আমীন।

সালাহ্ ইসলামের কঙ্কাল

আল্লাহর রসুল (সা.) বিভিন্ন সময়ে তাঁর আসহাবদেরকে ইসলামের প্রকৃত আকিদা বোঝাতে বিভিন্ন ধরণের উপমা বা উদাহরণ ব্যবহার করেছেন। যেমন একটি ঘরের সাথে ইসলামের তুলনা করে তিনি জেহাদ ও সালাতের সম্পর্ক আসহাবদের সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন- ইসলাম একটি ঘর, সালাহ তার খুঁটি এবং জেহাদ হলো ছাদ [হাদিস- মুয়ায (রা.) থেকে আহমদ, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ, মেশকাত]। এই উপমাতে রসুলাল্লাহ সালাহ ও জেহাদের সম্পর্ক, এদের উভয়ের প্রয়োজনীয়তা, এমনকি কোনটির প্রাধান্য বেশি (Priority) তা নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন। ছাদবিহীন একটি ঘরের কোনই মূল্য নেই, এমন কি সেই ঘর যদি দামি আসবাবপত্র ও গৃহস্থালী সামগ্রী দিয়ে সুসজ্জিত থাকে তবুও তা মূল্যহীন। এর খুঁটিগুলো যদি হীরা দিয়ে তৈরি থাকে তবুও ঘরের উদ্দেশ্য পূরণ হয় না; এ ঘরে কেউ বাস করতে পারবে না। বর্তমানে মুসলিম নামক এই জাতিটি ইসলামের ভিত্তি আল্লাহর সার্বভৌমত্বের (তওহীদ) বদলে দাজ্জালের সার্বভৌমত্বকে সার্বিক জীবনে স্বীকার করে নিয়েছে আর ছাদ অর্থাৎ জেহাদ (আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম) তাদের কাছে কেবল অপ্রয়োজনীয়ই নয়-অসহ্য। এখন তাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবাদত হচ্ছে সালাহ বা নামাজ। জান্নাতের প্রকৃত চাবি আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে (হাদিস- মু'আজ ইবনে জাবাল থেকে আহমদ) ত্যাগ করে এই জাতি নামাজকে জান্নাতের চাবী বানিয়ে নিয়ে সারা দুনিয়ায় লক্ষ লক্ষ সুদৃশ্য মসজিদে কেবল শূণ্যের উপরই খুঁটি গেঁড়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, এ খুঁটিগুলোর উদ্দেশ্য কী তাও তারা জানে না। ছাদ নির্মাণ না করে কেবল খুঁটি গাঁড়া যে কতটা নির্বুদ্ধিতার কাজ তা বোঝার জ্ঞানটুকুও আল্লাহর লা'নতের ফলে এ জাতির মধ্যে অবশিষ্ট নেই। ফলে এই সালাহ মুসলিম জাতির কোন কাজেই আসছে না; এ সালাহ তাদেরকে সকল জাতির লাথি ও ঘৃণা থেকে রক্ষা করতে পারছে না। ভিত্তি ও ছাদহীন খুঁটি সর্বস্ব এ ঘর (যদিও এমন ঘর অসম্ভব) তাদেরকে কোনই

নিরাপত্তা দিতে পারছে না। ইসলামের আকিদা বোঝানোর চেষ্টায় আমি আরও একটি উপমা পেশ করছি।

ধরা যাক পুরো মানবদেহটি হচ্ছে ইসলাম। এর মস্তিষ্ক (Brain) হচ্ছে আকিদা, হৃৎপিণ্ড (Heart) হচ্ছে তওহীদ, রক্ত সঞ্চালন (Blood Circulation) হচ্ছে জেহাদ এবং কঙ্কাল (Skeleton) হচ্ছে সালাহ। এই চারটি মানবদেহের অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ (Vital Organ)। যদি কোন মানুষের মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটে তাহলে সে পাগল হয়ে যায়। সে শারীরিকভাবে যতই সুস্থ সবল থাকুক, মানুষ হিসেবে তার কোন দাম থাকে না। এই মহা গুরুত্বপূর্ণ মস্তিষ্ক হচ্ছে আকিদা। এ জন্যই অতীত ও বর্তমানের সব আলেমরা একটি ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে আকিদা সঠিক না হলে ঈমানের কোন দাম নেই। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির আকিদা যদি সঠিক না হয় তাহলে তার ঈমান অর্থহীন এবং স্বভাবতই সেই ঈমানের উপর ভিত্তি করে করা সমস্ত আমলও মূল্যহীন। ধরুন, কয়েকজন পাগলকে এক স্থানে রাখা হলো। তারা সেখানে কী করবে? কেউ গলা খুলে গান করবে, কেউ গভীর দুঃখে চিৎকার করে কাঁদবে, আবার কেউ উলঙ্গ নৃত্য করবে ইত্যাদি। কারো মনে এ প্রশ্নই জাগবে না যে, কেন তাদেরকে এখানে আনা হয়েছে। তাদেরকে দিয়ে কোন কাজই করানো সম্ভব হবে না। গত এক হাজার বছরের বেশি সময় ধরে মুসলিম জাতিটির অবস্থাও ঠিক তেমন। কেউ নামাজকেই মুক্তির পথ মনে করে দিন রাত বহু ধরনের নামাজে রত, আবার কেউ ব্যস্ত যেকের করে ফানা ফিল্লাহ্ হওয়ার সাধনায়, কেউ ইসলামকে বিক্রি করে খাচ্ছে, কেউ বা একে বানিয়ে নিয়েছে রাজনৈতিক হাতিয়ার। এ পরিস্থিতির একমাত্র কারণ ইসলাম সম্পর্কে সঠিক আকিদা না থাকা। এজন্য মানব দেহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ যেমন মস্তিষ্ক, তেমনি ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আকিদা অর্থাৎ ইসলামের উদ্দেশ্য ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে সঠিক ও সম্যক ধারণা (Correct Comprehensive Concept)।

ইসলামের হৃৎপিণ্ড, প্রাণ হচ্ছে তওহীদ অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন এলাহ (সার্বভৌমত্বের মালিক ও হুকুমদাতা) নাই। তওহীদ বিহীন ইসলাম ইসলামই নয়। তওহীদ হলো এই দীনের ভিত্তি। একজন মানুষের মস্তিষ্কসহ শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুস্থ সবল কিন্তু যদি তার মধ্যে প্রাণ না থাকে তাহলে নিখুঁত দেহ নিয়েও সে একটি মরদেহ ছাড়া কিছু নয়, প্রাণহীন দেহ কিছুক্ষণের মধ্যেই পঁচতে গলতে আরম্ভ করে তাই তাড়াতাড়ি তাকে কবর দেয়া হয় বা পুড়িয়ে ফেলা হয়। তেমনি আল্লাহর সার্বভৌমত্বহীন ইসলামও মৃত। হৃৎপিণ্ডের কাজ কী? হৃৎপিণ্ডের কাজ হলো পাম্প করে সারা দেহে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা, সমস্ত দেহকে বাঁচিয়ে রাখা। জেহাদ (সর্বাত্মক প্রচেষ্টা) হচ্ছে সেই রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া। ইসলামে তওহীদের দাবি পূরণ করার জন্যই যেমন জেহাদ করতে হয় তেমনি মানব দেহের ক্ষেত্রেও হৃৎপিণ্ডের একমাত্র কাজই হচ্ছে রক্তকে সারা দেহে প্রবাহিত করা। এই তিনটি মানবদেহের অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বা প্রক্রিয়া (System)। এ ছাড়াও মানবদেহে কিডনি, ফুসফুস, পাকস্থলী ইত্যাদিসহ আরও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ আছে, তবে সেগুলো প্রথম তিনটির তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এসব অঙ্গ যদি আক্রান্ত হয় তাহলে চিকিৎসার মাধ্যমে তা সুস্থ করে তোলা যায়,

এজন্য মানুষ সঙ্গে সঙ্গে মরে যায় না। কিন্তু হৃদপিণ্ডের স্পন্দন (তওহীদ) যদি বন্ধ হয়ে যায় এবং রক্ত সঞ্চালন (জেহাদ) না হয় তবে তার পরিণতি হবে তাৎক্ষণিক মৃত্যু। এজন্যই আল্লাহ কোর'আনে বলেছেন- 'যদি তোমরা জেহাদ ত্যাগ করো তাহলে আমি তোমাদের কঠিন শাস্তি দেব এবং তোমাদের ওপরে অন্য জাতি চাপিয়ে দেব (অর্থাৎ তোমাদেরকে অন্য জাতির গোলাম, দাস বানিয়ে দেব (সুরা তওবা-৩৯)।' রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হয়ে গেলে যেমন মানুষ মৃত এবং অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায় তেমনি জেহাদ ত্যাগ করলে উম্মতে মোহাম্মদী মরে যাবে এবং তাদের অস্তিত্বের আর কোন প্রয়োজন থাকবে না। আজ যেমন অর্ধেক দুনিয়া জুড়ে ১৫০ কোটিরও বেশি উম্মতে মোহাম্মদীর দাবিদার এ জাতি বিরাট এক গলিত লাশের ন্যায় পড়ে আছে, কোন কাজেই আসছে না- শুধু গন্ধ ছড়াচ্ছে।

একইভাবে কঙ্কালও মানবদেহের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ধরুন, সুস্থ মস্তিষ্কের একজন মানুষ, তার দেহের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গও সুস্থ সবল অথচ তার দেহে কোন কঙ্কাল বা কাঠামো নেই, তাহলে তার অবস্থা কী হবে? কেবলই সে একটি গোশতের পিণ্ড। কারণ সে দাঁড়াতে পারবে না, বসতে পারবে না, চলাফেরা করতে পারবে না, কথা বলতে পারবে না, কোন একটি কাজও করতে পারবে না। এ অবস্থায় এই গোশতের স্তূপটির মধ্যে রক্ত সঞ্চালনও সম্ভব হবে না, কারণ শিরা উপশিরা গুলো একটি আরেকটার সাথে জড়িয়ে পেঁচিয়ে থাকবে। আর রক্ত সঞ্চালন না হলে এ ক্ষেত্রেও পরিণতি একই হবে অর্থাৎ মৃত্যু ও পচন। মানবদেহের কঙ্কালকে ইসলামে সালাহর সাথে তুলনা করলেও একই চিত্র ফুটে ওঠে। আল্লাহর খেলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্য যে চরিত্র দরকার সেই চরিত্র সালাহ ছাড়া অর্জন করা সম্ভব নয়। কঙ্কাল না থাকলে যেমন পরিণতিতে রক্তসঞ্চালন বন্ধ হয়ে দেহের মৃত্যু ঘটে তেমনি সালাহ সঠিক পদ্ধতি ও আকিদায় কায়েম না করা হলে ইস্পাতের ন্যায় ঐক্য, পিঁপড়ার মতো শৃঙ্খলা, মালায়েকের মতো আনুগত্য, আসহাবে রসুলদের মতো হেজরত এবং সংগ্রামের জন্য প্রয়োজনীয় চরিত্র সৃষ্টি হবে না, ফলে জেহাদ (সংগ্রাম) বন্ধ হয়ে জাতির মৃত্যু হবে এবং অন্য জাতির গোলামে পরিণত হবে। এ কারণেই সালাহকে আল্লাহ ফরদ করে দিয়েছেন।

মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, রক্তপ্রবাহ, কঙ্কাল ইত্যাদি ছাড়াও মানবদেহে আরও যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো আছে সেগুলোর মধ্যেও গুরুত্বের তফাৎ আছে। কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কোনটি তার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ, কোনটি আরও কম, তারপরে আরো কম। যেমন: এগুলোর পরেই আসে ফুসফুস, কিডনী, যকৃত ইত্যাদি। তারপর চোখ, কান, হাত পা। সবশেষে সৌন্দর্যের জন্য চুল, দাড়ি, গোফ, ভ্রু, চোখের পাপড়ি, নখ ইত্যাদি। চুল ও দাড়ি কেটে ফেললে শরীরের কোন ক্ষতিই হয় না। কারো নাক কেটে ফেললে তাকে দেখতে বিশ্রী দেখাবে কিন্তু সে মারা যাবে না। এমনকি যদি হাত পাও কেটে ফেলা হয় তবুও তার মৃত্যু হবে না। কিন্তু যদি মস্তিস্ক বিকৃতি ঘটে তাহলে সে পাগল হয়ে যাবে ও পৃথিবীতে তার কোন মূল্য থাকবে না। যদি হৃদপিণ্ডের স্পন্দন বা রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হয়ে যায় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হবে। রক্ত সঞ্চালনই আমাদের দেহকে জীবিত রাখে। এই রক্ত সঞ্চালনের কারণেই আমাদের দেহের অঙ্গ থেকে শুরু করে একক কোষ পর্যন্ত সবকিছু বেঁচে

থাকে, এমনকি আমাদের চুল নখের কোষগুলোরও জীবন ও বৃদ্ধি রক্ত সঞ্চালনের কারণেই সম্ভব হয়।

আজ থেকে ১৩'শ বছর আগে ইসলামের প্রকৃত খেলাফত শেষ হয়ে যাবার পর এই রক্ত সঞ্চালন অর্থাৎ জেহাদ বন্ধ হয়ে গেল। ফলে আল্লাহ তাঁর রসুলের (সা.) মাধ্যমে যে গতিশীল দীন (জীবন-ব্যবস্থা) পাঠিয়েছিলেন তাও প্রাণ হারিয়ে স্থবির হয়ে গেল। এই বিকৃতমস্তিষ্ক ও মরা জাতিকে আল্লাহর প্রয়োজন নেই, তাই আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক (সুরা তওবা -৩৯) এ জাতির ওপর থেকে তাঁর দয়ায় হাত সরিয়ে তাদেরকে কঠোর শাস্তির (আযাবুন আলীমা) মধ্যে নিক্ষেপ করলেন।

লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, আল্লাহ উম্মতে মোহাম্মদীকে তাঁর নির্বাচিত, নেয়ামতপ্রাপ্ত জাতি থেকে একটি অভিশপ্ত (মালাউন) জাতিতে পরিণত করলেন, তা কিন্তু এই জাতি বুঝতে পারল না। মো'মেনের সংজ্ঞা থেকে বের হয়ে যাওয়ার পরও তারা ভাবতেই থাকলো তারা এখনও রসুলের (সা.) হাতে গড়া মো'মেনদের মতই মো'মেন আছে। এ সময়ও তারা জেহাদহীন, রক্ত সঞ্চালনহীন মৃত ইসলামের আনুষ্ঠানিকতা যথাসাধ্য পালন করে যেতে লাগল, কারণ তাদের মস্তিষ্ক অর্থাৎ আকিদা বিকৃত হয়ে গেছে। কিন্তু এ মহাসত্য বোঝার অক্ষমতা জাতিকে স্বাভাবিক পচন প্রক্রিয়া এবং আল্লাহর প্রতিশ্রুত কঠোর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারল না। দুনিয়াময় তাদের পরাজয় ঘটল এবং আল্লাহ তাদেরকে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের গোলাম বানিয়ে দিলেন। নিষ্ঠুর পরিহাস এই যে, যাদেরকে আল্লাহ কঠিন শাস্তি দিয়ে এই জাতিকে তাদের একদা পরাজিত শত্রুর গোলাম করে দেওয়ার পরও তারা নামাজ, রোযা, হজ্জ, যাকাতসহ ইসলামের বহু রকম ফরদ, সুন্নাহ ও নফল এবাদতের আনুষ্ঠানিকতা করেই যেতে লাগল এবং এখনও করেই যাচ্ছে, এবং এগুলো করে নিজেদেরকে মহা মো'মেন ও উম্মতে মোহাম্মদী মনে করছে। আল্লাহ সেই সমস্ত আমলের দিকে একবারও চেয়ে দেখছেন না। এখনও তারা বিশ্বাস করে যে জান্নাত দরজা খুলে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। জেহাদ (সর্বাত্মক প্রচেষ্টা বা সংগ্রাম) ভুলে যাবার কারণে জেহাদের মূল অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কেও তাদের রয়েছে বিকৃত ধারণাপ্রসূত সীমাহীন অজ্ঞতা। তাই অন্যন্য ধর্মের অনুসারীদের মতই তাদের সমস্ত আমল আজ নিষ্ফল, নিরর্থক।

মরক্কো থেকে ফিলিপাইন পর্যন্ত ইসলামের এই বিশাল বিস্তৃত দেহটি আজ মরা ও দুর্গন্ধময়। অথচ এর অনুসারীরা এই মরা দেহটিকেই আকর্ষণীয় লেবাস পরাচ্ছে, খোশবু ও প্রসাধনী ব্যবহার করে সাজাচ্ছে, এর চুল দাড়ি আঁচড়িয়ে দিচ্ছে, চোখে সুরমা লাগিয়ে যে যার মতো সাজিয়ে তুলছে। তাদের দৃষ্টি, শ্রবণ ও ঘ্রাণ নেওয়ার ক্ষমতা লুপ্ত হয়ে যাবার কারণে তারা বুঝতে পারছে না যে, ইসলামের এ দেহটি তো বহুদিনের মরা, পঁচা, গলে যাওয়া একটি শবদেহ। এর মস্তিষ্ক (আকিদা) কাজ করছে না। এর আত্মা এখন আর প্রকৃত তওহীদ "লা-এলাহা এল্লা আল্লাহ-আল্লাহ ছাড়া কোন সার্বভৌম হুকুমদাতা নেই" নয়, সেটা বহু আগেই পরিবর্তিত হয়ে "লা-মা'বুদ এল্লা আল্লাহ - আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই" হয়ে গেছে। কলেমার এই ভুল অর্থ ইসলামের রক্ত সঞ্চালন বন্ধ করে দিয়েছে যার স্বাভাবিক

ফল হয়েছে ইসলামের দেহটির মৃত্যু, ক্ষয় ও পচন। শুধু তাই নয়, বিকৃত আকিদায় সালাহ কায়েমের কারণে এর কঙ্কালও এখন মোমের মতো নরম হয়ে গিয়েছে, ফলে এর কোন আকার নাই, গঠন নাই, গলিত গোশতপিণ্ডের স্তূপ হয়ে বিশ্বময় অথর্ব হয়ে পড়ে আছে।

এই মরা ইসলামের বিশাল দেহটিতে আবার প্রাণ সঞ্চার হবে যখন এতে ইসলামের রূহ- প্রকৃত তওহীদ প্রবেশ করবে, ১৩০০ বছর আগে মোনাফেক আমীর-ওমরাহদের বন্ধ করা রক্ত সঞ্চালন, জেহাদ আবার শুরু হবে। মৃত এ দেহটি তার হারানো গৌরব ফিরে পেয়ে আবার উঠে দাঁড়াবে। এ মরা জাতির জীবিত হওয়ার এটাই হচ্ছে একমাত্র উপায়। অন্য আর কোন পথ নেই। যদি এ জাতি আল্লাহর তওহীদ মেনে না নেয়, তাহলে আল্লাহর শাস্তি ও লা'নত হবে আরও কঠোর, আরও ভয়ঙ্কর। দেড়শো কোটির এ জনসংখ্যার প্রত্যেকেও যদি মহা পরহেযগার, তাহাজ্জুদী হয়ে যায়, সারাবছর রোযা রাখে, প্রতি বছর হজ্জ করে এবং সবরকম গোনাহ থেকে বিরত থেকে রিপুজয়ী মহা-সুফী হয়ে যায় তবুও তারা ইহ জগতে এবং পরকালে আল্লাহর কঠোরতম শাস্তির হাত থেকে পালাতে পারবে না।

কোন একজন মো'মেন বা গোটা জাতির আকিদা, তওহীদ, জেহাদ যতই উত্তম হোক, সালাহ যদি ঠিক না থাকে তাহলে ঐ ব্যক্তি বা জাতি কোনদিন উম্মতে মোহাম্মদী হতে পারবে না। যে চারিত্রিক কাঠামোর উপর উম্মতে মোহাম্মদী দাড়িয়ে থাকে সেই কাঠামোই হচ্ছে পাঁচ দফার চরিত্র। সালাহ সঠিক আকিদা নিয়ে নিখুঁত ও পরিপূর্ণভাবে কায়েম না করা গেলে ঐ পাঁচ দফার চরিত্র জাতির মধ্যে কায়েম হবে না। ফলে জাতি হবে ঐক্যহীন, আনুগত্যহীন একটি বিশৃঙ্খল জনগোষ্ঠী। কঙ্কাল না থাকায় কার্যক্ষমতা হারিয়ে, রক্তসংবহনতন্ত্র, শিরা, ধমনী রুদ্ধ হয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই সে মরে যাবে। সুতরাং মো'মেন সালাহতে যত বেশি আকিদাসম্পন্ন নিখুঁত ও নিয়মিত, সেই পারবে নিজের ভিতর উম্মতে মোহাম্মদীর চারিত্রিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করতে, আর কেউ পারবে না।

সালাতুল খওফ
উম্মতে মোহাম্মদীর অপরিহার্য অনুশীলন

আল্লাহ তাঁর রসুলকে হেদায়াহ ও সত্যদীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন এই জন্য যে, তিনি যেন একে অন্যান্য সকল জীবন ব্যবস্থার ওপরে বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠা করার প্রক্রিয়া হিসাবে আল্লাহ নির্ধারণ করলেন জেহাদ ও কেতাল অর্থাৎ সংগ্রাম। সেজন্য আল্লাহ রসুলকে পাঁচ দফাভিত্তিক একটি কর্মসূচিও দান করেছেন। এই দফাগুলো হচ্ছে- ঐক্য, শৃঙ্খলা, আনুগত্য, হেজরত ও জেহাদ। রসুল সত্যদীন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এমন একটি জাতি গঠন করেন যা ছিল একটি অপরাজেয় মৃত্যুভয়হীন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা জাতি, যাদের জাতীয় চরিত্রে উপরোক্ত পাঁচটি দফা সম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল। এই পাঁচ দফা রসুল তাঁর উম্মাহর চরিত্রে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সালাহ এর মাধ্যমে। অর্থাৎ আল্লাহ সালাহ কায়েমের হুকুম দিয়েছেন

তাঁর দেওয়া দায়িত্ব পালন করতে এ জাতির যে পাঁচদফা-ভিত্তিক চরিত্র অপরিহার্য সেই চরিত্র গঠনের প্রশিক্ষণস্বরূপ। রসুল বলেছেন, ইসলাম একটি ঘর, সালাহ তার খুঁটি, জেহাদ তার ছাদ [হাদিস- মু'য়ায (রা.) থেকে আহমদ, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ, মেশকাত]। আমরা কোর'আন হাদীসে বিভিন্ন প্রকারের সালাহ দেখতে পাই যেমন- ফরদ, ওয়াজেব, সুন্নাহ, নফল ইত্যাদি। এদের মধ্যেও আছে অনেক প্রকারভেদ। এই জাতি যখন তাদের জীবনের প্রধান দায়িত্ব দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ত্যাগ করলো, তখন স্বাভাবিকভাবেই সালাহ কায়েমের আকিদা বা উদ্দেশ্যও পরিবর্তিত হয়ে গেল। প্রশিক্ষণ থেকে সালাহ পরিবর্তিত হয়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভের একটি আনুষ্ঠানিক ধ্যান বা উপাসনায় পরিণত হলো। বর্তমানে এই বিকৃত উদ্দেশ্য নিয়েই ইসলামের প্রধান আমল হিসাবে দুনিয়াময় সালাহ পড়া হচ্ছে।

উম্মতে মোহাম্মদীকে সুশৃঙ্খল, আনুগত্যশীল, নিয়মানুবর্তী, সময় সচেতন এবং আত্মিকভাবে প্রস্তুত একটি জাতি হিসাবে গঠন করার জন্য দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ফরদ সালাহ কায়েমের হুকুম আল্লাহ দিয়েছেন। এ সালাহ কিভাবে কায়েম করতে হবে তা রসুল হাতে কলমে করে দেখিয়ে দিয়েছেন। মো'মেনরা যখন সফরে যাবেন তখন কসর সালাহ অর্থাৎ এই ফরদ সালাহগুলোর কোন কোনটি সংক্ষিপ্ত করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সফরকালীন অবস্থায় অথবা কোন অভিযানের উদ্দেশ্যে বের হলে কোন স্থানে যদি শত্রুর হামলার আশঙ্কা থাকে তাহলে এই কসর সালাহ একটি বিশেষ পদ্ধতিতে কায়েম করতে হয়। এটাই হচ্ছে "সালাতুল খওফ" (সুরা নেসা ১০১-১০২)। সালাতুল খওফের শাব্দিক অর্থ আশঙ্কাকালীন সালাহ। সালাতুল খওফ কায়েম করা আল্লাহর হুকুম, তাই এটি একটি ফরদ সালাহ। আল্লাহ কোর'আনে যতগুলো সালাতের কথা উল্লেখ করেছেন তার সবগুলোই শেখানোর ভার দিয়েছেন রসুলের (সা.) ওপর, এমনকি ওয়াক্তিয়া ফরদ সালাহও আল্লাহ নিজে শেখান নি, যে সালাতের হুকুম আল্লাহ ৮২ বার দিয়েছেন। একমাত্র সালাতুল খওফই এর ব্যতিক্রম। এটি শেখানোর ভার আল্লাহ নিজেই নিয়েছেন। এর নিয়ম কানুন তিনি বিস্তারিতভাবে পবিত্র কোর'আনে বলে দিয়েছেন। ওয়াক্তিয়া সালাতের নিয়মকানুন তিনি পবিত্র কোর'আনে বলে দেন নি, এমন কি কোন্ সালাহর কী সময়, কত রাকাত তাও কোর'আনে উল্লেখ নেই। এগুলো আমরা সবই জেনেছি রসুলের (সা.) মাধ্যমে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, যেই সালাহ আল্লাহ নিজে শেখালেন, যে সালাহ ফরদ, সেই সালাহ এই জাতি একেবারেই ভুলে গেল, অথচ ওয়াজেব, সুন্নাহ, নফল সালাহর বিষয়েও তারা অতি সতর্ক।

প্রকৃত ইসলামের আকিদা যখন বিকৃত হয়ে গেল তখন এই সালাতুল খওফের আকিদাও বিকৃত হয়ে গেল, বলা চলে একেবারে পরিত্যাক্তই হয়ে গেল। বহু শতাব্দী পার হয়ে গেছে এ উম্মাহ আর জেহাদে যায় না, শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কাও তাদের মনে জাগ্রত হয় না। তাই সালাতুল খওফেরও আর প্রয়োজন হয় না। অথচ রসুল (সা.) বহুবার আসহাবগণকে নিয়ে সালাতুল খওফ আদায় করেছেন। যাতুররিকা অভিযানে, বত্নে নখল এর অভিযানে এই সালাহ কায়েম করার কথা জানা যায়। কোন কোন বর্ণনায় পাওয়া যায় রসুল কাবার পরিবর্তে

যেদিক থেকে শত্রুবাহিনীর হামলার আশঙ্কা সেদিক মুখ করে তাঁর বাহিনীকে কাতারবদ্ধ করে সাজিয়েছেন। তারপর কোর'আনে উল্লেখিত নিয়মমাফিক সালাহ কায়েম করেছেন।

আল্লাহ বলছেন, "যখন তোমরা জমিনে সফরে বের হবে, তোমরা সালাহ 'কসর' করবে, এতে তোমাদের কোন দোষ হবে না। যখন তোমরা আশঙ্কা করো শত্রুরা তোমাদেরকে হামলা করবে, নিশ্চয়ই কাফেররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু, এমন অবস্থায় যখন আপনি তাদের মধ্যে থাকবেন এবং তাদের সালাহ করাবেন, তখন যেন মো'মেনদের মধ্য থেকে একদল এসে আপনার সাথে দাঁড়ায় এবং অস্ত্র-শস্ত্র তাদের সাথেই রাখে। অতঃপর যখন তারা সাজদা শেষ করবে তখন যেন আপনাদের পিছনে (প্রহরায় বা স্ব-স্ব দায়িত্বে) চলে যায় এবং দ্বিতীয় দল যারা সালাতে অংশগ্রহণ করে নাই তারা এসে দাঁড়ায় এবং আপনার সাথে সালাহ কায়েম করে, সতর্কতা অবলম্বন করে এবং অস্ত্র-শস্ত্র তাদের সঙ্গে রাখে। কেননা, কাফেররা চায় যদি আপনারা আপনাদের অস্ত্র-শস্ত্র ও রসদ সম্ভার হতে অমনোযোগী হন, তারা হঠাৎ আক্রমণ করবে। (সুরা নেসা ১০১-১০২)

এ আয়াত এবং রসুলাল্লাহর সুন্নাহ অনুসারে সালাতুল খওফের নিয়মগুলো হলো:

১) পুরো বাহিনীকে দু'টো দলে বিভক্ত করতে হবে।

২) এমাম প্রথম দলটি নিয়ে সালাতে দাঁড়াবেন। দুই রাকাত বিশিষ্ট এ সালাতে একমাত্র এমামই দুই রাকাতে অংশ নিবেন, আর মুক্তাদিগণের প্রত্যেক দল এক রাকাত করে কায়েম করবেন।

৩) সালাহ অবস্থাতেও প্রত্যেকের অস্ত্র তার সাথেই থাকবে। প্রত্যেকে সালাহ কায়েমের মধ্যেও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে থাকবেন সম্পূর্ণ সজাগ ও সচেতন।

৪) অপর অংশটি এ সময় অস্ত্র নিয়ে পাহারায় বা যার যার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবেন এবং প্রত্যেকে থাকবেন চূড়ান্ত সতর্ক (Alart)।

৫) প্রথম রাকাতের সেজদা থেকে উঠে দাঁড়িয়েই সালাহরত মোজাহেদগণ চলে আসবেন পাহারায় অর্থাৎ যারা এতক্ষণ সালাহতে অংশ নেন নাই তাদের অবস্থানে। তারা এসে পাহারায় অবস্থান নেওয়ার পর অর্থাৎ দায়িত্ব পূর্ণভাবে গ্রহণের পর পাহারারত দলটি এমামের পিছে গিয়ে সালাহতে অংশ নিবেন।

৬) দ্বিতীয় দল এসেই কাতার সোজা করে হাত বেঁধে ফেলবে। কাতার একটুও বাঁকা হওয়া যাবে না। তারা পুরোপুরিভাবে না দাঁড়ানো পর্যন্ত এমাম অপেক্ষা করবেন, এরই মধ্যে তার কেরাত (সুরা পড়া) চলবে। এমাম যখন বুঝতে পারবেন তার পেছনে দ্বিতীয় দলটি প্রস্তুত তখন তিনি রুকুতে যাবেন এবং বাকি এক রাকাত সালাহ শেষ করে সালাম ফেরাবেন।

৭) পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হবে চূড়ান্ত শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে। অবস্থান পরিবর্তনের সময় যেন কোনরূপ বিশৃঙ্খলা না ঘটে সেদিকে থাকতে হবে অত্যন্ত সতর্ক। প্রথম দল সেজদাহ থেকে উঠে সালাতের দৃঢ়তা বজায় রেখে ঋজুভাবে দ্রুত

দ্বিতীয় দলের সাথে অবস্থান পরিবর্তন করে নিবে। এ সময় ঢিলেঢালা আচরণ করা যাবে না। আর খেয়াল রাখতে হবে পাহারার স্থান যেন এক মুহূর্তের জন্যও শূন্য না হয়ে যায়।

৮) সালাহ শেষ করে এমাম পুরো বাহিনীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবেন অর্থাৎ সবকিছু ঠিকঠাক আছে কি না তা দেখবেন এবং আগের মতই সম্পূর্ণ বাহিনীর নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করবেন।

ইসলামের আকিদা বিকৃতির সাথে সাথে এর ছোট বড় প্রতিটি বিষয় বিকৃত হয়ে গেছে। শুধু বিকৃতই হয় নি, একেবারে বিপরীতমুখী হয়ে গেছে। এ বিষয়ে একটি উদাহরণ দেওয়া যায় এমন: একটি গাড়ি যখন পেছন দিকে যায়, তার চাকা, স্টিয়ারিং, বডি সব কিছু নিয়েই পেছন দিকে যায়, কোন একটি অংশ রেখে যায় না। ঠিক তা-ই হয়েছে ইসলামের বেলাতে। ইসলামী শরিয়াহর অনেক গবেষক সালাতুল খওফের আয়াতগুলো নিয়ে এমন মত প্রকাশ করেছেন যে, প্রশ্ন এসে যায় বর্তমান কালে সালাতুল খওফ পড়া জায়েজ কি না জায়েজ। কেউ চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে করতে একে এমন জটিল আকার দিয়েছেন যে, এর মধ্য থেকে সালাতের সঠিক রূপটি খুঁজে পাওয়াই কঠিন। পক্ষান্তরে কোন কোন বিশেষজ্ঞ এর কোন গুরুত্বই দেন নি। যে সালাহ কায়েমের হুকুম আল্লাহ নিজে দিয়েছেন, অর্থাৎ যে সালাহ ফরদ, যে একমাত্র সালাহ আল্লাহ নিজে শিখিয়েছেন সেই সালাহ কিভাবে পরিত্যাক্ত হয়েছে তার একটি উদাহরণ দিচ্ছি। গত জুন ২০০০ এ ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত ৭৪৮ পৃষ্ঠার বৃহদায়তন বই "দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম" এর সালাহ সংক্রান্ত অধ্যায়ে সর্বমোট ২২ রকমের সালাহর বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন তাহিয়াতুল ওযু, তাহিয়াতুল মাসজীদ, এশারাক, চাশত, আওয়াবীন, তাহায্যুদ, সালাতুল তাসবীহ, এস্তেখারার সালাহ, তারাবীহ, কুসুফ ও খুসুফের সালাহ, এস্তেস্কার সালাহ। কোন সালাহ কোন সময়ে, কত রাকাত, কী পদ্ধতিতে কায়েম করতে হবে তার সবই বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে মাত্র দুই প্রকার সালাহ ফরদ ওয়াক্তিয়া সালাহ ও জুম্মার সালাহ (কসরের সালাহ ওয়াক্তিয়া সালাহর অন্তর্ভুক্ত), বাকিগুলো ওয়াজেব, সুন্নাহ, নফল, মুস্তাহাব ইত্যাদি। এত প্রকারের সালাহর মধ্যে ফরদসহ একটিও আল্লাহ নিজে শেখান নি। কিন্তু সালাতুল খওফ তিনি ফরদ করে দিয়েছেন, এবং কেমন করে এ সালাহ কায়েম করতে হবে তার সম্পূর্ণটা তিনি নিজে শিখিয়েছেন, অথচ এই সালাহর কোন উল্লেখই এই বইতে করা হয় নি।

কোন কোন খ্যাতিমান আলেম সালাতুল খওফকে কেবল গুরুত্বহীনই করেন নি, এর উদ্দেশ্যও পাল্টে দিয়েছেন। যেমন হাকীমুল উম্মত মওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'বেহেশতী জেওর' এর ২য় খণ্ডে ছালাতুল 'খাওফের বয়ান' নামক অনুচ্ছেদে লিখেছেন, "যখনই কোন ভয়াবহ ঘটনা ঘটে বা কোন বিপদ বা বালা মুসিবত দেখা দেয়, তখন নামাজ পড়া সুন্নাত। যেমন- ঝড়ের সময়, ভূমিকম্পের সময়, বজ্রপাতের সময়, যখন অনেক বেশি তারা ছোটে (উল্কাপাত), শিলাবৃষ্টি বা বরফ পড়ে, অতিরিক্ত বৃষ্টি হতে থাকে, দেশে কলেরা-

বসন্ত বা প্লেগ ইত্যাদি মহামারী আকারে প্রকাশ পায় বা শত্রু ঘিরে ফেলে, কিন্তু এ সব নামাজের জন্য জামায়াতে নয়, প্রত্যেকে নিজে নিজে পৃথক পৃথকভাবে একাকী নামাজ পড়তে হবে।" সালাতুল খওফে সম্পর্কে মৌলানা সাহেবের এই অভিমত সম্পর্কে আমার কোন বক্তব্য নেই। তবে ঝড়, বৃষ্টি, উল্কাপাত, কলেরা, প্লেগ, মহামারি, ভূমিকম্প, বজ্রপাত, শিলাবৃষ্টি ইত্যাদির বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে নিয়ে প্রহরা দেওয়া কী অর্থ বহন করে তা আমার বোধগম্য নয়। তবে সব আলেমই এমন নয়, কেউ কেউ সত্যিকার সালাতুল খওফ সম্পর্কেও ভালো ধারণা দিয়েছেন। কিন্তু তারাও এ বিষয়টি নিয়ে আকিদা বিকৃতির কারণে এতটাই বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন যে তা আর আমাদের মতো সাধারণ মানুষের বোধগম্য নেই। উদাহরণ হিসাবে একটি প্রশ্ন পেশ করছি:-

সালাহরত অবস্থায় শত্রু আক্রমণ করলে কী করণীয়?

প্রশ্নটি খুবই অবান্তর মনে হচ্ছে, তাই না? প্রকৃতপক্ষেই প্রশ্নটি অবান্তর এবং বুদ্ধিহীন। অথচ এই প্রশ্নই ইসলামের ফকীহ, পণ্ডিতদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার বিষয়। সাধারণ জ্ঞানেই বোঝা যায়, জেহাদের ময়দানে যদি শত্রু সালাতের সময় আক্রমণ করে বসে তখনও সালাহ চালিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা, সালাতের চিন্তা করাও সম্ভব নয়। যে জেহাদের জন্য সালাহ, সেই জেহাদ চলাকালীন সময়ে জেহাদে অংশ না নিয়ে সালাহ কায়েম করা কেবল পাগলামি নয়, আত্মহত্যার নামান্তর। অথচ ইসলামের পরবর্তী যুগের জেহাদ-বিমুখ ফকীহরা সালাহকে এত গুরুত্ব দিয়েছেন যে তাদের কেউ কেউ জেহাদ চলাকালীনও সালাহ কায়েম করেই যেতে হবে, এমন মত পোষণ করেছেন। বিখ্যাত 'হেদায়াহ' গ্রন্থে সালাতুল খওফের ফতোয়ায় বলা হয়েছে, 'সালাহ অবস্থায় লড়াই করবে না, করলে সালাহ বাতিল হয়ে যাবে।' কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, 'কেননা খন্দকের দিন নবী ব্যস্ততার কারণে চার ওয়াক্ত সালাহ আদায় করেন নি।' খেয়াল করলে দেখবেন, যে বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এ উদাহরণ পেশ করা হলো তা বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। খন্দকের এ ঘটনা থেকেই সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে উল্লেখিত ফতোয়া ঠিক নয়। কিভাবে দেখা যাক। খন্দকের যুদ্ধের প্রাক্কালে নবী ও তাঁর সাহাবীরা শত্রুর মোকাবেলার একটি কৌশলস্বরূপ পরিখা খনন করছিলেন। এ সময় রসুল চার ওয়াক্ত সালাহ কায়েম করেন নি। এটি যুদ্ধ চলাকালীন কোন ঘটনা নয়। শত্রু তখনও আসেই নাই, কেবল প্রতিরক্ষার পূর্ব প্রস্তুতি চলছিল। প্রশ্ন হলো, প্রস্তুতির সময়েই যদি রসুল সালাহ পরিত্যাগ করে থাকেন, তাহলে যুদ্ধাবস্থায় সালাহ কায়েমের প্রসঙ্গ কিভাবে আসতে পারে? অথচ বিজ্ঞ ফকীহ বলেছেন, 'সালাহ অবস্থায় লড়াই করবে না।' এর অর্থ যুদ্ধের সময় ওয়াক্ত হলে সালাহ কায়েম করবে, লড়াই করবে না। শত্রু সকলকে নিশ্চিহ্ন করে ফেললেও সালাহ বাদ দেওয়া যাবে না। রসুলের (সা.) উপর্যুক্ত সুন্নাহ মোতাবেক ফতোয়াটি

হওয়া উচিত ছিল এমন, "যুদ্ধ অবস্থায় সালাহ কায়েম করবে না, করলে সালাহ হবে না। শুধু তা-ই নয়, যুদ্ধ-প্রস্তুতির ব্যস্ততম সময়েও সালাহ বন্ধ রেখে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।" আলেমদের এ জাতীয় সাধারণ জ্ঞান পরিপন্থী ফতোয়ার বাস্তব ফল হয়েছে এই যে, পরবর্তীতে বহুস্থানে শত্রুরা নামাজরত অবস্থায় মুসলিমদেরকে আক্রমণ করে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করে দিয়েছে। প্রতিরোধ করা তো দূরের কথা, আত্মরক্ষাও করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। এ নিয়ে বহু আল্লামা, মাশায়েখগণ গর্ব করে বলেছেন, "আমরা সেই জাতি যারা যুদ্ধের সময়েও নামাজ পড়ি।"

আকিদা বিকৃতির ফল কী ভয়ঙ্কর!

জেহাদ, কেতাল ও সন্ত্রাস

এই ছোট্ট পুস্তিকাটি (Booklet) প্রকাশ হবার পর থেকে এ পর্যন্ত যে বিষয়টি লক্ষ্য করা গেল তা হচ্ছে এই যে মুসলিম বলে পরিচিত এই জনসংখ্যার যে অংশটুকু এই দেশে আছে তাদের একাংশ হয় ভীত হয়েছেন না হয় চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। এই অংশটি হচ্ছে জাতির সেই অংশ যেটা কিছুতেই আল্লাহ, রসুলের দীন প্রতিষ্ঠা হোক তা চায় না। তারা আমাদের জীবনে আল্লাহর দেয়া জীবন-ব্যবস্থা, দীন প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে সন্ত্রাসী, জঙ্গিবাদ ইত্যাদি নাম দিয়ে মানুষের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করতে চান। আমার এই বইয়ে যে জেহাদ, কেতাল ইত্যাদিকে সন্ত্রাস বলে চিহ্নিত করতে চান। জেহাদ আর সন্ত্রাস এক জিনিস নয়, সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। জেহাদ শব্দের অর্থ কোন কাজ করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা; আর সন্ত্রাস হচ্ছে হিংসাত্মক কাজ করে, বোমা ফাটিয়ে, ধ্বংস করে ভয়-ভীতি সৃষ্টি করা। কিন্তু মুসলিম নামধারী কিন্তু কার্যত কাফের ও মোশরেক এই লোকগুলো জেহাদকে সন্ত্রাস বলে চালিয়ে, জেহাদের বিরুদ্ধে মানসিকতা গড়ে তুলতে চান। অথচ দীন প্রতিষ্ঠার এই জেহাদ অর্থাৎ প্রচেষ্টা ছাড়া দীনুল ইসলামই অসম্পূর্ণ; কারণ ঈমানের সংজ্ঞার মধ্যে, মো'মেন হবার সংজ্ঞা, শর্তের মধ্যেই আল্লাহ এই জেহাদ অর্থাৎ দীন প্রতিষ্ঠার এই প্রচেষ্টাকে, সংগ্রামকে ঢুকিয়ে দিয়ে রেখেছেন। (দেখুন- সুরা হুজরাত, আয়াত ১৫)

যারা আমাদের জীবনে আল্লাহর দীনুল হক, ইসলাম প্রতিষ্ঠা হোক তা চান না তারা স্বভাবতই এই প্রচেষ্টাকে অর্থাৎ জেহাদকেও চান না, এটাই স্বাভাবিক। তারা জেহাদ অর্থাৎ প্রচেষ্টাকে হেয়, মন্দ কাজ বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টায় একে সন্ত্রাসের সঙ্গে এক করে দিয়েছেন, যাতে সাধারণ মানুষ সন্ত্রাসকে ঘৃণার সাথে জেহাদকেও ঘৃণা করে। যেহেতু ইসলাম বিরোধী এই লোকগুলোর নিয়ন্ত্রণেই দেশের অধিকাংশ প্রচার ব্যবস্থা অর্থাৎ মিডিয়া (Media), সেহেতু তাদের অবিশ্রান্ত মিথ্যা প্রচারের ফলে তারা প্রায় সফলও হয়েছেন। মুসলিম ও মো'মেন হবার দাবিদারও আজ নিজেকে কোনভাবে জেহাদ অর্থাৎ দীনুল হক প্রতিষ্ঠার সঙ্গে জড়িত হবার কথা স্বীকার করতে ভয় পান এবং করেনও না।

সুতরাং প্রয়োজন হয়ে পড়েছে যে দীন প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় জেহাদ এবং কেতালের স্থান কোথায় তা নির্দিষ্ট করা। জেহাদ শব্দের অর্থ সংগ্রাম, সর্বাত্মক সংগ্রাম, প্রচেষ্টা। জেহাদ হচ্ছে দীন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা মানুষকে মুখে বলে, লিখে জানিয়ে, বক্তৃ

তা করে, যুক্তি উপস্থাপন করে, বুঝিয়ে ইত্যাদিভাবে। আর কেতাল একেবারে ভিন্ন শব্দ যার অর্থ সশস্ত্র যুদ্ধ। জেহাদ ব্যক্তি, দল, গোষ্ঠি ইত্যাদির পর্যায়ে এবং কেতাল রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে। কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠি বা দল যদি দীন প্রতিষ্ঠার জন্য অস্ত্র হাতে নেয় তবে সেটা হবে মারাত্মক ভুল। তাদের কাজ হবে মানুষকে যুক্তি দিয়ে কোর'আন-হাদিস দেখিয়ে, বই লিখে, বক্তৃতা করে অর্থাৎ সর্বপ্রকারে মানুষকে এ কথা বোঝানো যে পৃথিবীতে অন্যায়, অবিচার, নির্যাতন, শোষণ, ক্রন্দন, রক্তপাত, যুদ্ধহীন একটি সমাজে নিরাপত্তা ও ন্যায় বিচারের মধ্যে অর্থাৎ নিরঙ্কুশ শান্তিতে বাস করতে হলে একমাত্র পথ যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর দেয়া জীবন বিধান মোতাবেক আমাদের জীবন পরিচালনা করা। সাধারণ জ্ঞানেই বোঝা যায় যে, যে যে জিনিস তৈরি করেছেন তাঁর চেয়ে আর কে জানবে যে জিনিসটি কিভাবে চালালে সেটা ঠিকমত, ভালোভাবে চলবে। আল্লাহ সুরা মুলকের ১৪ নং আয়াতে বলেছেন– যে সৃষ্টি করেছে তার চেয়ে বেশি জান? (তুমি সৃষ্ট হয়ে?) এ যুক্তির কোন জবাব আছে? কিন্তু আমরা মো'মেন মুসলিম হবার দাবিদার হয়েও দাজ্জালের (ইহুদি খ্রিষ্টান বস্তুবাদী সভ্যতা) নির্দেশে আল্লাহর দেয়া দীন, জীবন-ব্যবস্থা থেকে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত অংশটুকু ছাড়া সমষ্টিগত (যেটাই প্রধান) অংশটুকু বাদ দিয়ে সেখানে নিজেরা বিধান, আইন-কানুন, নিয়মনীতি নির্ধারণ করে সেই মোতাবেক আমাদের সমষ্টিগত জীবন পরিচালিত করছি। ফল কী হয়েছে? শিক্ষা দীক্ষায়, বিজ্ঞানে, প্রযুক্তিতে মানব ইতিহাসের চূড়ান্ত স্থানে উপস্থিত হয়েও আজ পৃথিবী অশান্তি, অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার আর মানুষে মানুষে সংঘর্ষ ও রক্তপাতে অস্থির। তাহলে প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে যে মানুষ তার জীবন পরিচালনার জন্য যে ব্যবস্থা তৈরি করে নিয়েছে তা তাকে শান্তি ও নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। কাজেই মানুষকেই বোঝাতে হবে যে এ পথ ত্যাগ করে মানুষের সার্বভৌমত্বকে ত্যাগ করে আল্লাহর রসুল (সা.) যা শিখিয়েছেন সেই আল্লাহর সার্বভৌমত্বে ফিরে যেতে হবে, সেই সার্বভৌমত্বকে গ্রহণ করে তাঁর দেয়া দীন, জীবন-ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে আমাদের জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই কাজ কি জোর করে করানোর কাজ? এটাতো সাধারণ জ্ঞানেই বোঝা যায় যে জোর করে, শক্তি প্রয়োগ করে মানুষকে কোন কিছু বিশ্বাস করানো অসম্ভব।

হেযবুত তওহীদ এই কাজটাই করার সংকল্প করছে এবং করছে মানুষকে বুঝিয়ে, যুক্তি দিয়ে। আল্লাহর সার্বভৌমত্বে (উলুহিয়াতে) মানুষকে ফিরে আসার আহ্বান করছে। এই কাজ করার জন্য হেযবুত তওহীদ প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছে আল্লাহর রসুলের প্রক্রিয়া, অর্থাৎ তরিকাহ। তিনি কী করেছিলেন? মক্কী জীবনের তের বছর তাঁর আহ্বান অর্থাৎ বালাগ ছিল ব্যক্তি ও দলগত পর্যায়ে। তাই তিনি ও তাঁর দল সর্বপ্রকার অত্যাচার, মিথ্যা দোষারোপ, নির্যাতন সহ্য করেছেন– কোন প্রতিঘাত করেন নি। হেযবুত তওহীদের মোজাহেদরাও আজ ২৬ বছর ধরে মানুষকে তওহীদের, আল্লাহর সার্বভৌমত্বের বালাগ দিয়ে আসছে, এটি করতে যেয়ে তারা বিরুদ্ধবাদিদের গালাগালি খাচ্ছে, অপমানিত হচ্ছে, মার খাচ্ছে প্রচণ্ডভাবে নির্যাতিত হচ্ছে। দাজ্জালের অনুসারী, আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার বিরোধী এদের দ্বারা হেযবুত তওহীদের মোজাহেদরা বহুস্থানে বহুবার আক্রান্ত হয়েছেন,

তাদের আক্রমণে বহু মোজাহেদ সাংঘাতিকভাবে জখম, আহত হয়েছেন এবং অনেকেই শহীদ হয়েছেন। তাদের মিথ্যা প্রচারে ও প্ররোচনায় প্রভাবিত হয়ে পুলিশ মোজাহেদদের গ্রেফতার করছে, তাদের শারীরীক নির্যাতন করছে, জেলে দিচ্ছে, তাদের নামে আদালতে মামলা দিচ্ছে, এমন কি একেবারে মিথ্যা মামলাও দিচ্ছে। কিন্তু এই ২৬ বছরে ৫ শতাধিক মামলার একটিতেও কোন মোজাহেদ আদালতের বিচারে দোষী প্রমাণিত হয় নাই, একটিতেও শাস্তি হয় নাই।

হেযবুত তওহীদের জন্মের সময় থেকেই আমি নীতি হিসাবে রসুলের (সা.) এই তরিকা অনুসরণ করেছি। আমার কঠিন নির্দেশ দেয়া আছে কোন মোজাহেদ কোন রকম বে-আইনী কাজ করবে না, কোন আইন ভঙ্গ করবে না, কোন বে-আইনী অস্ত্র হাতে নেবে না। যদি আমি জানতে পারি যে কোন মোজাহেদদের কাছে কোন বে-আইনী অস্ত্র আছে তবে আমিই পুলিশে খবর দিয়ে তাকে ধরিয়ে দেব। এই পরিপ্রেক্ষিতে কোন মোজাহেদ কোন বে-আইনী কাজ করে কোন অস্ত্র মামলায় আদালত থেকে শাস্তি পায় নাই। কিন্তু তাতে পুলিশের হয়রানি করা থামে নাই। হেযবুত তওহীদ সম্বন্ধে মিডিয়ার (সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি) অবিশ্রান্ত মিথ্যা প্রচারে প্রভাবিত হয়ে পুলিশ এখনও এখানে সেখানে মোজাহেদদের গ্রেফতার করছে, আর কোন অপরাধ না পেয়ে ৫৪ ধারায় অভিযুক্ত করে চালান দিচ্ছে কিন্তু স্বভাবতই আদালত থেকে কোন সাজা হচ্ছে না।

আল্লাহর রসুলের (সা.) তের বছরের মক্কি জীবনও ছিল শুধু এক তরফা নির্যাতন। তারপর মদীনার মানুষ যখন তাঁর তওহীদের ডাক গ্রহণ করলো, তখন তিনি হেজরত করে সেখানে যেয়ে রাষ্ট্র গঠন করলেন। যেই রাষ্ট্র গঠন করলেন তখনই নীতি বদলে গেল। কারণ কোন রাষ্ট্র কোনদিন ব্যক্তি বা দলের নীতিতে টিকে থাকতে পারে না। তখন তাঁর প্রয়োজন হবে অস্ত্রের, সৈনিকের, যুদ্ধের প্রশিক্ষণের। আল্লাহর রসুলও তাই করলেন– হাতে অস্ত্র নিলেন এবং তখন থেকে তাঁর পবিত্র জীবনের বাকিটার সমস্তটাই কাটলো যুদ্ধ করে। অর্থাৎ তওহীদ-ভিত্তিক এই সত্যদীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তি গোষ্ঠি বা দলগতভাবে কোনও কেতাল অর্থাৎ সশস্ত্র যুদ্ধ নেই, আছে শুধু তওহীদের, আল্লাহর সার্বভৌমত্বের আহ্বান, বালাগ দেয়া। ঠিক তেমনি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আছে সশস্ত্র যুদ্ধ। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অস্ত্র, যুদ্ধ ইত্যাদি যদি আইন সম্মত না হয় তবে পৃথিবীর সব দেশের সামরিক বাহিনীই বে-আইনী, সন্ত্রাসী। কোর'আন ও হাদীসে যে জেহাদ ও কেতালের কথা আছে তা রাষ্ট্রগত। হেযবুত তওহীদের মোজাহেদদের বাড়িতে যেয়ে তাদের গ্রেফতার করার কথা ফলাও করে কাগজে, রেডিও, টেলিভিশনে প্রচার করা হয়। টেলিভিশনের পর্দায় তাদের হাতকড়া পড়ানো অবস্থায় দেখানো হয়; আর দেখানো হয় আমার লেখা পুস্তিকাগুলো, এই বইটি ও ইসলামের প্রকৃত রূপরেখা, দাজ্জাল? ইহুদি-খ্রিষ্টান 'সভ্যতা'!, হ্যাণ্ডবিল ইত্যাদি। পুলিশ এবং মিডিয়ার লোকজনদের, টিভির পর্দায় বুক ফোলানো ছবি দেখে মনে হয় তারা গুপ্তধন খুঁজে পেয়েছেন। অথচ ঐ বইগুলো আমার নির্দেশে অনেক আগেই বাংলাদেশের অধিকাংশ থানায় মোজাহেদরা নিজেরা যেয়ে পৌঁছে দিয়েছে। দ্বিতীয় কথা হলো বলা হয় ঐ জব্দ করা বইগুলো জেহাদি বই– ওতে জেহাদ ও কেতালের কথা লেখা আছে। জেহাদ

এবং কেতালের কথা লেখা আছে বলে যদি ঐ বইগুলো জব্দ অর্থাৎ বাজেয়াপ্ত করা হয় তবে তাদের কাজটি অসম্পূর্ণ থেকে গেল; কারণ ঐ বাড়িতেই অন্তত আরও দুইটি বই আছে যাতে আমার বইয়ে জেহাদ ও কেতাল যতবার লেখা আছে তা থেকে বহুগুণ বেশিবার ঐ শব্দ দুটি, জেহাদ ও কেতাল লেখা আছে। শুধু লেখা আছে নয় যা করার জন্য সরাসরি আদেশ দেওয়া আছে, এবং করলে মহাপুরস্কার এবং না করলে কঠিন শাস্তির কথা লেখা আছে। ঐ বই দুইটির একটি আল্লাহর কোর'আন এবং অন্যটি রসুলের (সা.) হাদিস। ঐ বই দুইটি বাজেয়াপ্ত না করে শুধু আমার ছোট ছোট দু'একটি পুস্তিকা বাজেয়াপ্ত করে তা উঁচু করে টিভির পর্দায় দেখানো অযৌক্তিক, যুক্তিসম্মত নয়।

আমরা কোর'আন-হাদিস দেখিয়ে, যুক্তি দিয়ে, প্রমাণ দিয়ে মানুষকে বোঝাতে চেষ্টা করছি যে তওহীদ-ভিত্তিক দীন, জীবন-ব্যবস্থা ছাড়া মানুষের জীবনের শান্তি ও নিরাপত্তার আর কোন বিকল্প পথ নেই। বর্তমান অশান্ত পৃথিবীই তার প্রমাণ। এখানে জোর জবরদস্তির কোন স্থান নেই, মানুষকে জোর করে কোন কিছু বোঝানো যায় না এটি সাধারণ জ্ঞান (Common sense), মানুষ যদি একে গ্রহণ করে তবে দেশে তওহীদ-ভিত্তিক দীন, জীবন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে, আর যদি মানুষ আমাদের ডাকে সাড়া না দেয়, মানুষের সার্বভৌমত্বকেই, মানুষের উলুহিয়াতকেই আঁকড়ে ধরে থাকে তবে আমাদের কিছু করার নেই। আল্লাহর যা ইচ্ছা করবেন। আর যদি মানুষ আমাদের কথা বোঝে, সাড়া দেয়, দাজ্জালের শেখানো বর্তমানের মানুষের সার্বভৌমত্বকে অর্থাৎ শের্ক ও কুফর ছেড়ে দিয়ে তওবা করে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব অর্থাৎ তওহীদ-ভিত্তিক দীন, জীবন-ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে তবে তখন আসবে কেতালের অর্থাৎ সশস্ত্র সংগ্রামের, যুদ্ধের সময়। সুতরাং এখন যে হেযবুত তওহীদকে জঙ্গি, জেহাদি, সন্ত্রাসী ইত্যাদি বলে প্রচার করা হয় তা জঘন্য মিথ্যা ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। আজ হেযবুত তওহীদকে ঐভাবে চিত্রিত করার যে আপ্রাণ চেষ্টা হচ্ছে তার বিরাট এবং গভীর কারণ আছে। কিন্তু তা এখানে আলোচনা করার নয়। কিন্তু তাদের এ চেষ্টা ইনশাল্লাহ ব্যর্থ হবে কারণ হেযবুত তওহীদ যে মহাসত্য প্রচার করছে তার চেয়ে বড় আর কোন সত্য আসমান ও জমিনে নেই, আর তা হলো আল্লাহর তওহীদ, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব অর্থাৎ লা এলাহা এল্লাল্লাহ, মোহাম্মাদুর রসুলাল্লাহ (দ.)।

আল্লাহ সুরা তওবার ৩২ নং আয়াতে বলেছেন– তারা (কাফের, মোশরেকরা) তাদের মুখের ফুঁৎকার দিয়ে আল্লাহর নুরকে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর নুরের পূর্ণ উদ্ভাসন ছাড়া অন্য কিছু চান না, তা কাফেরদের কাছে যত অপ্রীতিকরই হোক। এনশাল্লাহ তারা হেযবুত তওহীদকেও ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিতে পারবে না।